যুগ-বিপ্লব

(নাটক)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ নং কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান
কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩ নং কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রাবণ, ১৩৫৮

মুদ্রাকর—শ্রীপরমানন্দ সিংহ রায়
শ্রীকালী প্রেস
৬৫নং সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

প্রীতিভাজনেষু

টালা পার্ক
১৫ই আগস্ট ১৯৫১ ।

তারাশঙ্কর

ভূমিকা

'যুগ-বিপ্লব' নাটকখানি তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক। আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভে 'মারাঠা-তর্পণ' নামে একখানি নাটক লিখেছিলাম। নাটকখানি শখের রঙ্গমঞ্চে সেকালে সার্থকতা লাভ করেছিল। বর্তমানে কলকাতার কোন বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ নাটকখানি মঞ্চস্থ করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং সংশোধন ক'রে দিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। সংশোধন করতে ব'সে অত্যন্ত বিব্রত হলাম। নামে ঐতিহাসিক নাটক হ'লেও তার মধ্যে ইতিহাস ছিল না। ঐতিহাসিক পাত্রপাত্রী নিয়ে একটি কাল্পনিক কাহিনী অবলম্বনে গড়া নাটক, এবং কি যে সম্ভব এবং কি অসম্ভব সে নিয়েও মাথাব্যথা ছিল না। মোগল বাদশার রঙমহলে যে খুশি ঢুকেছে, মোগল বাদশার বেগম যত্রতত্র আবির্ভূত হয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন, ইত্যাদি অনেক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। এই কারণে নূতন ক'রে ইতিহাস আলোচনা ক'রে নাটকখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নূতন ক'রে লিখলাম নাটকে একটি নারীচরিত্র শুধু কাল্পনিক। আবদালী আমেদশাহ পরলোকগত সম্রাটের কন্যা অসামান্যা রূপসী হজরত বেগমকে বিবাহ ক'রে নিয়ে গিয়াছিলেন। প্রথম যখন আবদালী এই প্রস্তাব পাঠান, তখন দিল্লীর বেগম-মহলে ক্রন্দনের রোল উঠেছিল। মায়েরা বলেছিলেন, মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারব তবু ওই ব্যাধিগ্রস্ত বর্বরের হাতে কন্যা সমর্পণ করব না। কন্যা নিজেও বলেছিল, আমি বিষ খাব। কিন্তু আবদালীর বর্বর শক্তির সম্মুখীন হয়ে কোথায় ভেসে গেল সে সংকল্প! কিন্তু

সেই কন্যার আত্মা কি আত্মসমর্পণ করেছিল? সে কি আবদালীর হাত স্পর্শোদ্যত হবা মাত্র ম'রে যায় নি? নাটক রচনার সময় এই আত্মাকেই নসীবন-চরিত্রে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছি। অন্যথা কোন চরিত্র বা কোন ঘটনা অনৈতিহাসিক নয়। ইতিহাসকে গভীর শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে আমি অনুসরণ করেছি এবং সেই দিক দিয়ে এই নাটক রচনায় আন্তরিক পরিতৃপ্তি পেয়েছি। আমার অনুজোপম সাহিত্যিকেরা নাটক শুনেছেন এবং মুগ্ধ হয়েছেন।

কিন্তু তাতে আমার ভাগ্যে রঙ্গালয়ের প্রত্যাখান-প্রাপ্তিযোগ খণ্ডিত হয় নি। যে রঙ্গালয় আমার কাঁচা রচনা পছন্দ করেছিলেন, তাঁরাই এ নাটক প্রত্যাখান করলেন। আমার প্রথম বয়সে 'মারাঠা-তর্পণ' একদা আর্ট থিয়েটার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল; আবার পরিণত বয়সে 'মারাঠা-তর্পণ' 'যুগ-বিপ্লব' নামে পুনর্জন্ম নিয়েও লাঞ্ছনার ভাগ্যকে অতিক্রম করতে পারলে না। তাতে আমার আক্ষেপ নাই। আমার দৃঢ় ধারণা এ নাটকে আমি নূতন কিছু করতে পেরেছি, ইতিহাসকে নাটকে পরিণত করেছি। 'যুগবিপ্লব' নূতনত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক, ভাষার দিক দিয়েও নূতন সৃষ্টির চেষ্টা করেছি। রঙ্গমঞ্চেও এ নাটকের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার অবসরে সঙ্গীতের সূত্রে অথবা অন্য কোন সূত্র দিয়ে অভিনয়ের প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ এবং অখণ্ডিত রাখবার চেষ্টা করেছি। আঙ্গিকের দিক থেকে এটুকুও বোধ হয় নূতন।

আরও বক্তব্য ছিল। কিন্তু থাক্। সে সব প্রকাশের নয়। সে থাক্। নিন্দা প্রত্যাখান ব্যর্থতা—জীবনে সাধনার সোপান। অঙ্গার অগ্নিস্পর্শে জ্বলন্ত হোক, আমার গ্লানিকে ভস্ম ক'রে আমাকে বিশুদ্ধ করুক।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাত্র-পাত্রী পরিচয়

মহিউল মিল্লাত	—	কামবক্সের পৌত্র
আশরফ	—	ঐ অনুচর
শাহফানা	—	ফকির মিল্লাতের গুরু
আমিদুল মুল্ক	—	ইতিহাস-কুখ্যাত দিল্লীর উজীর
রেজাখাঁ	—	আমীর
ইয়াকুব আলি	—	ঐ (আফগান)
নরিন্দর গিরি গোস্বামী		ইতিহাস-বিখ্যাত গিরি-সম্প্রদায়ের নেতা। সন্ন্যাসী
বালাজী বাজী রাও	—	মারাঠা পেশোয়া
বিশ্বাস রাও	—	ঐ পুত্র
সদাশিব রাও ভাও	—	ঐ খুল্লতাতপুত্র
রঘুনাথ রাও	—	ঐ সহোদর
আবদালী আহম্মদশাহ		বিখ্যাত আফগান বাদশা
নাজিবউদ্দৌল্লা	—	রোহিলা নবাব
রঘু জাঠ	—	জাঠ রাজপুত (চাষী মোড়ল)
জবাহির	—	ঐ পুত্র

নাগরিক, নাশাক্‌চ (আফগান মিলিটারী পুলিস), কালাপোশ (দিল্লীর মিলিটারী পুলিস) সৈনিক, জাঠ চাষী, গিরি সন্ন্যাসী ইত্যাদি

উধমবাঈ	—	মৃত মহম্মদশাহের অন্ধ বেগম
নসীবন বা ছোটি হজরত বেগম	—	ঐ কন্যা
গন্না বেগম	—	কবি কুঞ্জলি খাঁর ঔরসে তয়ফাওয়ালীর গর্ভজাত কন্যা। সে নিজেও কবি
মানাবাঈ	—	গন্নার সহচরী, পরে আবদালীর বন্দিনী
রতনবাঈ	—	রঘু জাঠের স্ত্রী, জবাহিরের মা

নর্ত্তকী, তরুণী, বাঁদী, রমণীগণ ইত্যাদি

যুগ-বিপ্লব

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দিল্লী শহরের বহির্ভাগ। শহর হইতে বাহিরে যাইবার একটি ফটকের মুখ। ফটকটি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে, কোন রক্ষী নাই।

কাল—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস, শীতার্ত প্রথম প্রহর রাত্রি।

চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। শহরের কোথাও আলো নাই। অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়াছে কুয়াসা। মনে হইতেছে, এ যেন রাত্রির অন্ধকার নয়, এ যেন নিয়তির অন্ধকার। শাহ আবদালী আমেদ দুরানী চতুর্থবার ভারত আক্রমণ করিয়াছে। গত তিনবার সে দিল্লী প্রবেশ না করিয়া পাঞ্জাব হইতেই ফিরিয়া গিয়াছিল। এবার সে আটক অতিক্রম করিয়া লাহোর পর্যন্ত আসিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। লাহোরকে পিছনে রাখিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইয়াছে। কোথাও কেহ একটু আঙুল তুলিয়াও বাধা দিতে সাহসী হয় নাই। আটক হইতে সরহিন্দ পর্যন্ত যে পথে তাহারা আসিয়াছে, সে পথের দুই পাশের বসতি শ্মশান হইয়া গিয়াছে। সমস্ত হিন্দুস্থান আতঙ্কিত। দিল্লী শহর হতচেতন। শহরে আলো নাই, পাহারা নাই, বাজার হাট বন্ধ, শহরের শাসন-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সম্পন্ন ব্যক্তিরা পলায়ন করিয়াছে। বাদশাহী সিপাহীরা নিজেরাই লুঠতরাজ শুরু করিয়া দিয়াছে। সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ। মূল বাহিনী আফগান রোহিলা মনসবদার নাজিবখাঁর নেতৃত্বে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আবদালীর পক্ষে যোগ দিবার জন্য দিল্লী ত্যাগ করিয়াছে। হতাশায় আতঙ্কে মধ্যবিত্তেরাও পলাইতে শুরু করিয়াছে। সহসা যেন কেহ কোথাও কোন নারীকে ছুরিকাঘাত করিল।

যবনিকা অপসারিত হইবার মুহূর্তেই একটা মরণার্ত নারীকণ্ঠের চীৎকারে এই অন্ধকার চিরিয়া গেল। সুদীর্ঘ একটা আ—শব্দ। শব্দটি শেষ হইল—বোধ হয় তার মৃত্যুতে। তারপর সব স্তব্ধ। শুধু অতি করুণ যন্ত্রসঙ্গীতের মত একটি ক্ষীণ ক্রন্দন-

ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে প্রবেশ করিল একদল পলায়নপর নরনারী। নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কাঁধে কাঁধে পোঁটলা, কাঠের তোরঙ্গ। মেয়েদের দুই-তিনজনের কোলে শিশু। দুই-তিনটি বালক হাত ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে।

তাহারা প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। ভয় পাইল তাহারা। যন্ত্র-সঙ্গীতের মত ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি যাহা বাজিয়াই চলিয়াছে, সেই ধ্বনি কয়েক মুহূর্তের জন্য উচ্চ হইয়া উঠিল। অগ্রবর্তী ব্যক্তি থামিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সকলের পিছনে প্রবীণ ব্যক্তিটি চাপা গলায় বলিল—

প্রবীণ ব্যক্তি—আঃ! দাঁড়ালে কেন? (চাপা গলার কথা কয়টি ভয়কে যেন বাড়াইয়া দিল)

অগ্রগামী—(আঙুল তুলিয়া ইঙ্গিত করিয়া) শুনছ?

প্রবীণ—শুনেছি। কান্না। কাঁদছে। চল—চ'লে চল।

অগ্রগামী—কান্না?

অন্যজন—রোদন? রোতি হ্যায়? কৌন?

প্রবীণ—দিল্লী। দিল্লী রোতি হ্যায়।

একটি বালক—(সভয়ে চাপা গলায়) মা!

প্রবীণ—চুপ, চুপ, শুনতে পাবে। চারিদিকে বাদশাহী সিপাহী লুঠ ক'রে বেড়াচ্ছে।

অগ্রগামী—দিল্লী? দিল্লী কাঁদছে?

প্রবীণ—হাঁ হাঁ। দিল্লী। দিল্লী কাঁদে। বিপদের সময় দিল্লী কাঁদে।

[দূরে কোথায় বন্দুকের শব্দ হইল, সকলে চমকিয়া উঠিল]

প্রবীণ—এখন চ'লে এস। চারিদিকে ঘুরছে বাদশাহী সিপাহী লুঠেরা! নিঃশব্দে চ'লে এস। নিঃশব্দে পা চালিয়ে চ'লে এস।

[তাহারা সভয়ে দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেল]

[তাহারা চলিয়া গেল। জনহীন নগরপ্রান্তের বুকে শুধু সেই একটানা ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি বাজিয়া চলিল। ইহার মধ্যে নেপথ্য হইতে কথা বলিতে বলিতে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। দুইজনেরই সর্বাঙ্গ কালো আঙরাখায় আবৃত। একজন বয়স্ক

সম্রান্তদর্শন ব্যক্তি ; ইনি সম্রাট ঔরংজেবের পুত্র কামবক্সের পৌত্র, নাম—মহি-উল-মিল্লাত, পরে ইনি কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় শাজাহান নামে বাদশাহ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় জন একজন অনুচর,—নাম আশরফ]

মিল্লাত—(নেপথ্য হইতে) তাই তো, এ কোথায় এসে পড়লাম আশরফ ?

[প্রবেশ করিলেন]

এ যে শহর শেষ হয়ে গেল ! এই তো ফটক। এ কোন্ ফটক ?

আশরফ—তাই তো আলিজাঁহা ! আঁধিয়ারায় কিছু ঠাওর করতে পারছি না। একটা লোক নেই যে, পথ জিজ্ঞাসা করি।

মিল্লাত—আমার তো কিছুই ঠাওর হচ্ছে না আশরফ। সারা জীবনটাই কাটল বন্দীদশায়। অভিশপ্ত বাদশাহী ! বাদশাহ্-বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এ অভিশাপের ভাগ না নিয়ে উপায় নেই। বাদশাহ্-বংশের একজন হয় বাদশাহ্—বাকি সব শাহজাদা থাকে বন্দী। ভাঙা থালায় পোড়া রুটি, ফুটো গেলাসে জল আর চারিপাশে শক্ত পাথরে গাঁথা দেওয়াল—এই তার ভাগ্য। প্রথম যৌবনে দেখা দিল্লী শহর—সে প্রায় ভুলেই গিয়েছি। কিন্তু এখন যাবে কোথায় ?

আশরফ—ওদিকে হজরত সাহ ফানা অধীর হয়ে উঠেছেন আপনার জন্যে।

মিল্লাত—গুরু আমাদের পাগল আশরফ, পাগল। নইলে ভেঙে-পড়া একটা ইমারত বাবরশাহী বাদশাহী, তাকে তিনি আবার খাড়া ক'রে তুলতে চান ! মিছেই আমাকে কয়েদখানা থেকে বের করলেন।

[নেপথ্যে কোথায় বন্দুকের শব্দ হইল। আশরফ ব্যস্ত হইয়া মিল্লাতকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইল]

আশরফ—গুলি—গুলি ছুটছে। চলুন জনাবালি, এদিক থেকে ফিরে চলুন।

মিল্লাত—ফিরব তো! কিন্তু সে কোন্ দিকে?

আশরফ—বুঝতে পারছি না। আলো নেই, পাহারা নেই, মানুষ নেই—আঁধিয়ারায় সব ঢেকে গিয়েছে। কাউকে জিজ্ঞাসা করব এমন একটা মানুষ নেই।

মিল্লাত—চামড়ার মত পুরু অন্ধকার, তার সঙ্গে সফেদ মিহি মসলিনের মত কুয়াসা! একেই বলে নসীব! দিল্লীর নসীব। রৌশনে, মহফিলে, জলসায়, গানে, হাসিতে, হল্লায় ঝলমল সরগরম শহর দিল্লী! সিরাজীর আমেজে মশগুল শহর দিল্লী! আতরগুলাবের খুশবয়ে ময়-ময় শহর দিল্লী। সেই দিল্লী আজ আঁধিয়ারায় থমথম করছে! ভয়ে বেহোঁশ হয়ে গিয়েছে। কবরস্তানের মত খাঁ-খাঁ করছে। বাতাসে উঠছে পচা মুরদার বদ্‌বয়। মানুষ পালিয়েছে, পালাচ্ছে—ভেড়ির পালের মত। রাস্তায় ঘুরছে চোর-ডাকাত লুঠেরা গুণ্ডা। বাবরশাহী বাদশাহী! হিন্দুকুশ পার হয়ে আফগানেস্তান পর্যন্ত তার এলাকা। তার তোপ আর ফৌজের ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপত দুনিয়া। আজ আফগান-লুঠেরা আহমদ শাহ আবদালী আটক থেকে দিল্লীর ফটক পর্যন্ত এসে গেল, কেউ আঙুল তুলে একটা বাধা দিতে সাহস করলে না। হা-রে-হা! বাদশাহী ফৌজ লড়াইয়ের ভয়ে কেল্লা থেকে পালিয়ে শহর লুঠ করতে যেতে উঠেছে! আবদালী দিল্লী ঢুকবে, তারা ভাগবে লুঠের মাল নিয়ে।

[হঠাৎ থামিয়া গেলেন। উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সেই কান্না উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে]

আশরফ! শুনছ আশরফ?

আশরফ—শুনেছি জনাবালি। চ'লে আসুন। ও কান্না শুনবেন না।

মিল্লাত—কেন আশরফ? ও! তুমি সেই কান্নার কথা বলছ? এ কান্না সেই কান্না? দিল্লীর কান্না?

আশরফ—হ্যাঁ, জনাবালি। শুনেছি দিল্লী কাঁদে। যখনই বিপদ আসে—

মিল্লাত—হ্যাঁ, যখনই বিপদ আসে, তখনই দিল্লী কাঁদে। নাদিরশা যখন এসেছিল, তখন দিল্লী কেঁদেছিল। শুনেছি, তার আগেও কেঁদেছে দিল্লী। কিন্তু—

[মাটিতে বসিয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেন]

মাটির ভিতর থেকেই যেন কান্না উঠছে।

আশরফ—জনাবালি, কে আসছে। জনাবালি!

মিল্লাত—স্পষ্ট জেনানীর আওয়াজে কাঁদছে দিল্লী।

আশরফ—জনাবালি! (সে বাহির করিল তাহার তলোয়ার)

[প্রবেশ করিল একজন যুবক চাষী। জাঠ রাজপুত, নাম—জবাহির সিং। গ্রাম্যযুবক]

আশরফ—কে? কে তুমি?

জবাহির—(পিছাইয়া গিয়া তলোয়ারে হাত দিয়া) আমি—আমি একজন জাঠ-চাষী। তুমি—আপনারা? আপনারা কে?

আশরফ—কি মতলব তোমার?

জবাহির—দোহাই ভগবানের, কোনও বদ মতলব আমার নেই। আমি একটু বিপদে পড়েছি—

মিল্লাত—বল জাঠ জোয়ান, কি বিপদে পড়েছ?

জবাহির—আপনারা এখানকার লোক জনাব?

মিল্লাত—হ্যাঁ, আমরা এই শহরেরই লোক।

জবাহির—আঃ, বাঁচলাম, এত বড় রাস্তাটায় একজনও লোক পাই নি। একটি মেয়েকে আপনারা আশ্রয় দিতে পারেন জনাব?

মিল্লাত—মেয়ে?

জবাহির—হ্যাঁ, জনাব। দেখে মনে হ'ল খুব বড় ঘরের মেয়ে। কুঁইয়ার ভিতর প'ড়ে গিয়েছিল, যন্ত্রণায় বেহোঁশ হয়ে কাতরাচ্ছিল। মাটির ভিতর থেকে সে কাতরানি শুনে থরথর ক'রে ভয়ে আমি কেঁপে উঠেছিলাম প্রথমটা, তারপর সাহস ক'রে খুঁজে দেখতে গিয়ে তাকে পেলাম। তাকে তুললাম কুঁইয়া থেকে। বড় ঘরের মেয়ে—রাধারাণীর মত সুরত। এখনও বেহোঁশ হয়ে রয়েছে। তার ভার যদি দয়া ক'রে আপনারা নেন জনাব। আমি দেহাতী চাষী, বাড়ি চ'লে যাচ্ছি—ভেবে পাচ্ছি না তাকে নিয়ে কি করব ?

মিল্লাত—চল পাঠ জোয়ান, চল, কোথায় সে মেয়ে ?

জবাহির—আসুন জনাব। আর এই কাঁকনিটা, এটা কি ক'রে খুলে গেল তার হাত থেকে। আমি কুড়িয়ে রেখেছি। এটা তাকে দেবেন।

[কাঁকনিটি দিল এবং সকলে চলিয়া গেল। কান্না উঠিতে লাগিল। কাতরানি শব্দ]

[প্রবেশ করিল আর চারজন লোক। প্রথমেই একজন সিপাহী। তাহার পিছনে, দিল্লীর উজীর, ইতিহাসে কুখ্যাত আমিদুল মুল্ক গাজীউদ্দীন, বয়স ত্রিশ বৎসর। অপরজন বৃদ্ধ, নাম—রেজাখাঁ ; অন্যজন ইয়াকুব আলিখাঁ পাঠান—দিল্লীর বাসিন্দা, আবদালীর উজীর ওয়ালীখাঁর সহোদর, প্রৌঢ় ব্যক্তি। সিপাহীটা সর্বাগ্রে প্রবেশ করিয়া ওই কান্নার ভয় পাইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের গলা চাপিয়া ধরিয়া আর্তনাদ রোধ করিবার চেষ্টা করিল]

সিপাহী—আ—(গলা টিপিয়া ধরিল নিজের)

ইয়াকুব—(দ্রুত পিছন হইতে আসিয়া পিঠে হাত দিয়া) এই—এই! কি হয়েছে ? এই!

সিপাহী—(আতঙ্কের সঙ্গে) রোতি হ্যায়, হুজুর—দিল্লী রোতি হ্যায়!

ইয়াকুব—ডর নেহি হ্যায়। ডর নেহি হ্যায়। (গায়ে হাত দিয়া অভয় দিলেন) গোটা শহর ভয় পেয়েছে। ওর দোষ কি! এই কান্না সর্বত্র। কে জানে! বলছে—দিল্লী রোতি হ্যায়।

আমিদ—জাহান্নমে যাক দিল্লী। রেজাখাঁ, আমি কি করব বল?

ইয়াকুব—কি করবেন? চলুন আপনি শাহ্ আবদালীর কাছে।

আমিদ—আমি তার সামনে দাঁড়াব কি ক'রে? ওঃ! আবদালীর সেই ভয়ঙ্কর মুখ। কান নেই, বসা নাক—ওঃ! আমি মারাঠাকে ডেকে পাঞ্জাব থেকে তার সুবাদারনী মুঘলানীকে তাড়িয়েছি। রোহিলা পাঠানদের দোয়াব লুঠিয়েছি। আবদালী হুকুম দিয়েছিল—মুঘলানী বেগমের বেটী উমধা বেগমকে আমাকে সাদি করতে হবে, সেও আমি করি নি। আজ রেজাখাঁর হাতে সোনার থালায় দু' দু' লাখ টাকা পাঠালাম, সে তা ছোঁয় নি।

রেজা—মাটির উপর থুতু ফেলে পায়ে ঠেলে সরিয়ে দিলে থালাখানা। হা-হা ক'রে হেসে মুঘলানীকে ডেকে বললে—আরে বেটী, তোর হবু দামাদ কি নজর পাঠিয়েছে দেখ্! নে, তুই এটা নিয়ে যা। আমাকে বললে—আরে রেজা, কমসে কম দু ক্রোড় রূপেইয়া তো লে আয় পহেলে।

আমিদ—দু ক্রোড় রূপেইয়া! সারা দিল্লীতে দু ক্রোড় দামড়ির জোগাড় করতে পারব না আমি, দু ক্রোড় রূপেইয়া কোথায় পাব!

ইয়াকুব—তা হোক। তবু আপনি চলুন আমার সঙ্গে। রেজাখাঁ কাজ গুছিয়ে আসতে পারে নি, কিন্তু আমি গুছিয়ে এসেছি। আমার দাদা শাহ্ আবদালীর ওয়াজীর ওয়ালীখাঁর সঙ্গে পাক্কা বাত ব'লে এসেছি।

আমিদ—কি সে পাক্কা বাত?

ইয়াকুব—প্রথম দফা আপনাকে নিয়ে। আপনি মুঘলানীর অপমান করেছেন, তার বেটী—খানদানী বংশের বেটী উমধাকে সাদি না ক'রে তয়ফাওয়ালীর বেটী গন্না বেগমকে সাদি করতে চেয়েছেন। এর জন্যে আপনাকে মাফ চাইতে হবে।

আমিদ—চাইব।

ইয়াকুব—উমধা বেগমকে সাদি করতে হবে।

আমিদ—রাজী।

ইয়াকুব—গন্না বেগমকে শাহ বাঁদী ক'রে পাঠিয়ে দেবেন কন্দাহার, ঝাড়ুদারকে দিয়ে দেবেন—

আমিদ—তাতেও আমার আপত্তি নেই ইয়াকুব আলিখাঁ। কিন্তু গন্না কোথায় আমি জানি না। কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করব আমি। তয়ফাওয়ালীর নেশা আমার মিটে গেছে। আমি তার খবর রাখি না। শুনেছি, তারা দিল্লী ছেড়ে পালিয়েছে।

ইয়াকুব—আচ্ছা, সে ওয়ালীসাহেব আবদালীকে বুঝিয়ে দেবেন। আর—

আমিদ—আর ?

ইয়াকুব—শাহ আবদালী নতুন সাদি করবেন। মুঘলানী তাকে বলেছে, দিল্লীর হারেমে দুই শাহজাদী আছে, যাদের সুরতের মত সুরত ইরান থেকে হিন্দোস্তানে আর নেই। এক মহম্মদ শাহের বেটী হজরত বেগম, আর কে এক ফকিরিনী বেগম। মধ্যে তাদের দুজনকেই চাই।

আমিদ—পাবেন।

ইয়াকুব—শাহের বেটা শাহ তৈমুর সাদি করবেন বাদশাহ আজিজুদ্দীন আলমগীরের বেটী গৌহরউন্নেসাকে।

আমিদ—তাই হবে।

ইয়াকুব—ঝেনাব পর্যন্ত তামাম পাঞ্জাব এলাকা আফগানেস্তানের সরহদ্দির ভুক্তান হবে।

আমিদ—হবে। তাও হবে।

ইয়াকুব—আর টাকা—

আমিদ—টাকা আমার নেই ইয়াকুব আলিখাঁ।

ইয়াকুব—ভাল। টাকা তিনি এসে দিল্লীতে আদায় ক'রে নেবেন।

আমিদ—দিল্লীর কাছে আদায় করুন, আমার আপত্তি নেই। আমার উপর জুলুম না হ'লেই হ'ল। আমাকে রক্ষা করবে কে?

ইয়াকুব—মুঘলানীর বেটীকে সাদি করলে আপনাকে রক্ষা করবে মুঘলানী বেগম। শাহ আবদালী মুঘলানীকে বলে—বেটী। ওয়াজির সাহেব, মুঘলানীই শাহকে দিল্লীর তামাম খবর জোগাচ্ছে।

[দূরে নাকাড়া বাজিয়া উঠিল—ডুগ-ডুগ-ডুগ]

ইয়াকুব—(শব্দ লক্ষ্য করিয়া ত্রস্তভাবে) ওয়াজির সাহাব, শাহ আবদালীর নাশাকৃচি আসছে। এক পাশে স'রে আসুন। স'রে আসুন। বড় ভয়ঙ্কর ওরা।

[দুইজন নাশাকৃচি প্রবেশ করিল। নাশাকৃচি সেকালের মিলিটারী পুলিস জাতীয় সিপাহী। একজনের কাঁধে একটা নাকাড়া। অপরজনের কাঁধে শিঙা জাতীয় একটা বাঁশী]

নাশাকৃচি—(ঘোষণা করিতে করিতেই প্রবেশ করিল) পীর আলম, আল আমীন, দুর্রী দুর্রানী, শাহ আহমদ আবদালী বাদশাহের হুকুমৎ জারী—। (প্রবেশ করিয়াই ইহাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল)—কৌন্ হ্যায়? কে তোরা? আ! ইয়াকুব আলি সাহাব! ওয়াজির ওয়ালী খাঁ সাহাবের ভাই! আমি আপনাকে চিনি। বন্দেগী হুজুর এরা কারা?

ইয়াকুব—দুর্রী দুর্রানী বাদশাহের তাঁবেদার সবাই। ইনি দিল্লীর শাহন-শাহের ওয়াজির খানি খানান—আমিদুল মুল্ক—নজফর জঙ্গ।

নাশাকৃচি—আ! আচ্ছা। এই ওয়াজির আমিদুল মুল্ক! (হাসিল) মুঘলানী বেগমের হবু দামাদ! চ'লে যাও ওয়াজির সাহাব—

আমাদের ওয়াজির সাহাবের আদমী ছাউনির বাইরে তোমার জন্তে খাড়া রয়েছে। জলদি যাও। ঘড়ি-ঘড়ি শাহ আবদালী হিন্দোস্তানের সুরুযের মত তেতে উঠছে। আরে ভাই, বাজা নাকাড়া।

[ডুগ-ডুগ শব্দে নাকাড়া বাজাইতে লাগিল—ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ]

নাশাকৃচি—এই ঘড়ি থেকে সারা শহর দিল্লী—তামাম মুলুক হিন্দোস্তানে শাহ আবদালীর খাস একতিয়ার, বাদশাহী হক কায়েম হ'ল।

[ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ]

নাশাকৃচি—দিল্লী শহরওয়ালে মুসলমান—কাফের—ফিরিঙ্গী—জেনানা—মর্দানা—

[প্রস্থান করিল]

ইয়াকুব—আর দেরি করবেন না ওয়াজির আমিদুল মুল্ক।

আমিদ—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) চলুন খাঁ সাহেব। রেজাখাঁ, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

ইয়াকুব—(সিপাহীকে) আরে সিপাহী, তুই ফিরে যা। ওয়ালীখাঁর তাঁবুতে আমরা বাঁচব, তোকে বাইরে মেরে ফেলবে। ফিরে যা তুই।

[তিনজনে প্রস্থান করিলেন]

সিপাহী—(দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উর্ধ্বমুখে) দিল্লী রোতি হায়। এয় খোদা—দোয়া করো—দোয়া করো—মেহের-বা-ন!

[প্রস্থান করিল]

[তীব্র তীক্ষ্ম স্বরে অভিসম্পাত দিতে দিতে প্রবেশ করিল গন্না বেগম। সে আহত। কপাল হইতে রক্তের ধারা গড়াইতেছে। তাহার পিছনে প্রবেশ করিলেন মিল্লাত এবং তাঁহার অনুচর আশরফ]

গন্না—এয় খোদা, হে ঈশ্বর, হে বিচারক, তুমি আকাশ থেকে বিজলী হানো অত্যাচারীর মাথায়। আর ধ্বংস কর অক্ষম, অপদার্থ,

ভীরু মুঘল বাদশাহ-বংশকে। ভূমিকম্পে দিল্লীর কেল্লাটা ভেঙে চুরমার ক'রে ওদের চাপা দিয়ে দাও। কবরশাহী কর—কবরশাহী কর।

আশরফ—কেন মা মিথ্যা অভিসম্পাত দিচ্ছ? থাম থাম।

গন্না—কেন? কেন থামব?

মিল্লাত—তুমি জখম হয়েছ বেটী, তুমি অসুস্থ।

[গন্না কপালে হাত দিয়া রক্ত অনুভব করিয়া অন্ধকারের মধ্যেও হাতের রক্ত দেখিতে চেষ্টা করিল]

আশরফ—কপালে তোমার চোট লেগেছে। কুঁইয়ার মধ্যে তুমি প'ড়ে গিয়েছিলে।

গন্না—প'ড়ে যাই নি, নিজেই আমি লাফিয়ে পড়েছিলাম।

আশরফ—(সবিস্ময়ে) কেন? নিজে লাফিয়ে পড়েছিলে কেন?

মিল্লাত—বুঝতে পারছ না আশরফ, কোন অত্যাচারীর হাত থেকে ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে ঝাঁপ খেয়েছিল।

আশরফ—কে? এক জাঠ চাষী?

গন্না—জাঠ চাষী? না। বাদশাহের বাদাকশাহী সিপাহী। আবদালী আসছে, লড়াইয়ের ভয়ে তারা কেল্লা থেকে পালাচ্ছে। পথে শহর লুঠছে, জেনানীর ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। দেব না অভিসম্পাত আমি? আমার মা আর আমি দিল্লী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিলাম, পথে তারা আমাদের উপর পড়ল। মাকে খুন করলে। লুঠে নিলে আমাদের বয়েল গাড়ির সব কিছু জিনিস। আমি ছুটে গিয়ে কুঁইয়া দেখে তাতেই পড়লাম ঝাঁপ দিয়ে। আমার নসীব। কুঁইয়াতে জল ছিল না, ছিল ঘাস আর ছিল আমারই মত কজন হতভাগিনীর শবদেহ। তাদের উপর পড়লাম, চোট খেলাম, মরণ হ'ল না।

মিল্লাত—জন্ম-মৃত্যুর মালেক খোদাতয়লা বেটী। তুমি বেঁচেছ, সে তাঁর মরজি।

গন্না—ঝুট, ঝুট, ঝুট। বিলকুল ঝুটা বাত। আঃ! তোমরা আমাকে কেন বাঁচালে বল তো?

আশরফ—তুমি কুঁইয়ার ভিতর প'ড়ে আর্তনাদ করছিলে মা।

গন্না—আমার হোঁশ ছিল না। হোঁশ থাকলে মুখ টিপে প'ড়ে থাকতাম। যে মরণ হয় নি, সে মরণ হ'ত আমার শেষ রাত্রির শীতে। না হ'ত, আর কোন জেনানী আমার উপর লাফিয়ে পড়ত—আমি মরতাম। নয়তো না খেয়ে শুকিয়ে, তিয়াসে ছাতি ফেটে আমি মরতাম। কেন তোমরা আমাকে তুললে? হায় পুণ্যলোভী ফকির! আমাকে বাঁচিয়ে সেই পুণ্যে তোমরা যাবে বেহেস্তে, আর আমি? আমি কোথায় যাব, আমার কি হবে—সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না।

মিল্লাত—না মা, তোমাকে বাঁচানোর পুণ্য আমাদের নয়। তোমায় বাঁচিয়েছে একজন জাঠ-জোয়ান, দেহাতি চাষী। সে আশীর্বাদ অভিসম্পাত কিছুই কামনা করে নি। তোমাকে আমাদের হাতে দিয়ে চ'লে গেছে।

গন্না—আরে রে রে মেরি নসীব! বাঁচালে একটা চাষা! তার যেমন বুদ্ধি সে তেমনি করেছে। এখন আর একটা মরণের উপায় আমাকে ব'লে দিতে পার?

মিল্লাত—কেন? মরবে কেন মা? খোদা যখন তোমাকে বাঁচিয়েছেন, তখন বিশ্বাস কর তোমাকে দিয়ে তাঁর কাজ আছে।

গন্না—খোদা, ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য—এ সবে বিশ্বাস আমার ছুটে গিয়েছে ফকির। তুমি জান না আমার পরিচয়।

মিল্লাত—তুমি কে মা?

গন্না—বলতে পারব না। জিজ্ঞাসা ক'রো না।

[মাথার উপরে একটা প্যাঁচা ডাকিয়া গেল]

আশরফ—প্যাঁচা ডেকে গেল আলিজাঁহা। ঠিক এই সময়ে ফকির সাহেব হাজির থাকবেন রঙমহলের দরজায়। আর দেরি করবেন না।

গন্না—আলিজাঁহা? রঙমহল? কে আপনি জনাবালি? হতভাগ্য বাদশাহ্-বংশের কে আপনি?

মিল্লাত—পরিচয় দিলে কি চিনবে মা? বাদশাহ্-বংশ তো বহুবিস্তৃত।

গন্না—বলুন আপনি। আমি চিনব।

মিল্লাত—শাহানশাহ আলমগীরের পুত্র কামবক্সের পৌত্র আমি।

গন্না—বন্দেগী জনাবালি। আপনি আলিজাঁহা মহিউল মিল্লাত সাহেব? জনাবালি, খোদাতয়লার কাছে আরজ জানাই—আপনাদের দুর্ভাগ্যের শেষ হোক। তৈমুরশাহী বংশ প'চে গেছে, ধ'সে গেছে, এবার ধ্বংস হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাক।

মিল্লাত—(কয়েক মুহূর্তে স্তব্ধ থাকিয়া) খোদার যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হবে মা। তাতে দুখ নেই। কিন্তু তুমি কে?

গন্না—আমি তয়ফাওয়ালী যমনাবাঈয়ের বেটী গন্না বেগম—রট্টা-বাই।

মিল্লাত—তুমি গন্না বেগম? কবি গন্না বেগম? কবি কুইলিখাঁর বেটী?

গন্না—হ্যাঁ। আবদালী আসছে, আমাকে বাঁদী ক'রে পাঠাবে কান্দাহার। তার ঝাড়ুদারকে দেবে বকশিস। বুঝতে পারছেন আমার বুকের জ্বালা? কি অন্ধকার আমাকে গিলতে আসছে কল্পনা করতে পারেন? কেন আমি কুঁইয়ার ভিতর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতে পারছেন?

মিন্নাত—তুমি তোমার পিতৃবন্ধু নবাব বাঙ্গাশের কাছে যাবে মা ?

গন্না—না। আমার বাবা মাকে ধর্মমতে সাদি করেন নি। আমি রইস সমাজে অচল। আর তাদের আমি কাউকে বিশ্বাসও করি না।

মিন্নাত—তবে ?

গন্না—আমাকে যমুনা পার ক'রে দিন। দেহাতে দেহাতে গরীবের ঘরে আশ্রয় চাইব। আর চীৎকার ক'রে বলব—আবদালীকে তোরা খেদিয়ে দে। দিল্লীর বাদশাহের তোরা বিচার কর্। আর খোদাকে ডেকে বলব—। না, খোদাকে ডাকব না। যে আগুন সে আমার নসীবে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেই আগুন আমি মানুষের বুকে বুকে জ্বালিয়ে দোব। আমাকে যমুনা পার ক'রে দিন।

মিন্নাত—কিন্তু তুমি এই আহত দেহে যাবে কি ক'রে ?

গন্না—আবদালী এসেই আমাকে জানবারের মত বেঁধে কান্দাহার পাঠাবে ; আহত দেহ ব'লে তো মানবে না, রেয়াত করবে না জনাবালি।

মিন্নাত—তুমি ঠিক বলেছ মা। আমি ওটা কল্পনা করিনি।

গন্না—(বলিয়াই চলিয়াছিল) তা ছাড়া, শক্তি আমার আছে। হাউই তো দেখেছেন জনাব। জ্বলতে জ্বলতে নিজেকে সে যত ক্ষয় করে, তত সে ছোটে। আমার বুকে আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আমি ছুটব। আমি পারব।

[নেপথ্যে নাকাড়া বাজিয়া উঠিল]

মিন্নাত—এস মা, তাই এস।

[সকলে প্রস্থান করিল]

[নাকাড়া বাজিয়াই চলিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তর

একেবারে নিচের তলায় 'দেউড়ি-ই-সালাতিন' নামক অংশ। এই স্থানটি সম্রাট-বংশের অবহেলিত অবজ্ঞাত পোষ্যবর্গের আশ্রয়। এই অংশে তাঁহারা বাস করেন; সামান্য তনখায় গ্রাসাচ্ছাদন চলে। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত দিন যাপন করেন। এই দেউড়ি-ই-সালাতিনের মধ্যে দুইখানি ঘরের একটি মহল। এক দিকে মূল রঙমহলের বিশাল প্রাচীর। মাঝখানে ছোট এক টুকরা উঠানের মত ছোট জায়গা। সেই উঠানে একটি বেদী, বেদীর উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন—এক অপরূপ সুন্দরী কুমারী কন্যা; তাঁহার অঙ্গে সবুজ রঙের আলখাল্লা জাতীয় ফকিরিনীর পরিচ্ছদ। দীর্ঘ রুক্ষ কেশভার অবেণীবদ্ধ। রাত্রিকাল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু বেদীর উপর কুমারীটির সম্মুখে বাতিদানে একটি বাতি জ্বলিতেছে। একটিমাত্র বাতির আলো মেয়েটির মুখের সামনে একটি স্বল্পপরিধির আলোকমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র, বাকী অন্ধকার দূর করিতে পারে নাই। কুমারীটি ভূতপূর্ব সম্রাট, বর্তমানে অন্ধ এবং বন্দী আহমদ শাহের ভগ্নী উধমবাঈয়ের কন্যা—নাম নসীবন্নেসা, সাধারণত 'ফকিরিনী বেগম" বলিয়া পরিচিত। উধমবাঈ তাঁহাকে ফকিরিনীর জীবনে অভ্যস্ত করিয়াছেন।

বাতিদানের সামনে কিতাবদানে একখানি বই খোলা রহিয়াছে। কিন্তু নসীবন্নেসা বই পড়িতেছেন না। তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দূরে কেল্লার ফটকে নাকাড়া বাজিতেছে এবং ঘোষণা চলিতেছে তাই শুনিতেছেন।

প্রথম দৃশ্যের শেষে যে নাকাড়া বাজিতেছিল—সেই নাকাড়া বাদ্য, দৃশ্য পরিবর্তনের সময়ের মধ্যেও বাজিয়া চলিবে, এবং দুইটি দৃশ্যের মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার সূত্র টানিয়া রাখিবে।

নাকাড়া বাজিতেছিল—ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ। নাকাড়া থামিল

(ঘোষণা শুরু হইল)—হুকুম জারী—শহর দিল্লীর কাজী, ইমাম মুফতি মৌলানা লোগোঁর উপর—

দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর—কাল ফজর নামাজ থেকে মসজেদে মসজেদে

খুদবা পড়া হবে—আফগানেস্তানের বাদশা পীর আলম আল আমিন দুরী দুরানী শাহ আবদালীর নামে। অন্য কোন বাদশাহের নামে খুদবা পড়া কাল থেকে বন্ধ—বাতেল।

[নাকাড়া আবার বাজিল—ডুগ-ডুগ-ডুগ। ঠিক এই সময়ে রঙমহলের অর্থাৎ ভিতরের দিক হইতে নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—নসীবন। বেটী!

নসীবন—(চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)—মা!

[দরজা দিয়া হাতড়াইয়া অন্ধ উধমবাঈ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইলেন]

উধম—হাঁ বেটী। আবদালী পাঠানের হুকুমজারী শুনলি? দিল্লীর বাদশার নামে আর খুদবা পড়া হবে না। রদ হয়ে গেল তৈমুরশাহী বাদশাহের নাম।

নসীবন—শুনেছি মা। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

উধম—প্রাণের আশঙ্কায় ছুটে গিয়েছিলাম।

নসীবন—কিন্তু তোমার যে দৃষ্টি নেই, তুমি অন্ধ—আর এই পাথরের কেল্লা—

উধম—পাঁচ বছরের অভ্যাসে দিল্লী কেল্লার গলিঘুঁজি সব আমি দেখতে পাই। একটা বাঁদী আমাকে ব'লে গেল। এ কি? এ কি? নসীবন!

[নসীবন ছুটিয়া গিয়া উধমবাঈয়ের হাত ধরিল]

নসীবন—স'রে এস মা, স'রে এস, ধরতি কাঁপছে।

উধম—ভূমিকম্প! (তীক্ষ্ণকণ্ঠে আক্রোশভরা উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন) জয় মেহেরবান খোদা, হে ভগবান, দুনিয়া ধ্বংস ক'রে দাও। চুরমার ক'রে দাও সব। কি হ'ল? থেমে গেল? আ, ছি-ছি-ছি!

নসীবন—ব'স তুমি এইখানে, ব'স।

উধম—বসব? না। আঃ, মা ধরতি আর একবার তোমার

মাথা নাড় মা। আর একবার! অন্তত এই মুঘল কেল্লাটা ধ্ব'সে প'ড়ে যাক, বাদশাহ-বংশ কবরশায়ী হোক।

নসীবন—মা!

[নেপথ্যে আবার নাকাড়া বাজিয়া উঠিল—ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ]

উমধা—চুপ কর! শোন আবার কি হুকুমৎ জারী হচ্ছে।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর ঘোষণা করিল—কাল পহর ভর বেলার সময় শাহ দুরদুরানী শাহানশাহী তসলীম নিয়ে লাহোর দরওয়াজা দিয়ে উচলকি শড়ক বরাবর এসে পৌঁছুছবেন লাল কেল্লায়। সঙ্গে আসবে আবদালশাহী বেগম মহল। উচলকি শড়ক বরাবর দু-পাশের বাড়ির কোন দরওয়াজা কি জানালা খোলা থাকতে পাবে না। ঝরোকায় কি ছাদের উপর কোন আদমী থাকবে না। কাল্ তামাম দিন শহরে বাজারে কেউ বের হবে না। দিল্লীর বাদশাহ শড়ক বরাবর এগিয়ে গিয়ে শাহ দুরানীকে নজরানা দিয়ে কেল্লায় নিয়ে আসবেন।

[ঘোষণা শেষ হইল, নাকাড়া বাজিল—ডুগ-ডুগ-ডুগ-ডুগ]

উমধা—শুনলি নসীবন?

নসীবন—শুনলাম মা।

উমধা—আমি অন্ধ হয়েও ছুটে গিয়েছিলাম, বাঁদী আমাকে ব'লে গেল—আবদালীর মনসবদার জেহানখাঁ এসেছে রঙমহল দখল করতে। আজিজুদ্দিন আলমগীর দাঁতে কুটো ক'রে আবদালীর সঙ্গে আপোস করেছে। আপোস! ঝুটা বাত বেটী—গোলামের মত তার হুকুমৎ মেনে নিয়েছে। আমি জানি যে, আমার মন যে আমাকে বললে। আঃ, ছি-ছি-ছি!

নসীবন—মা, তুমি কি বলছ?

উমধা—বুঝতে পারছিস নে! পারবি নে বুঝতে। আমি দিল্লীর বাদশাহী চালিয়াছি, আমি বুঝি। আপোস শুধু হয় না। ক্রোড়-ক্রোড় রূপেয়া চাই, গোটা একটা মুলুক চাই। আর চাই—চাই বাদশাহ ঘরের শাহজাদী! রূপা মাটি বেটী, দৌলত রাজ ইজ্জত—এই হ'ল আপোসনামার দাম। সে দাম দিতে হবে তৈমুরশাহী বাদশাহ-বংশকে। আমি শুনে এলাম, শাহনশাহ সাজাহানের পিয়ারী বেগম মমতাজমহলের পবিত্র কামরা খোলা হচ্ছে। শাহ আবদালীর বাসর হবে।

নসীবন—মমতাজমহলের পবিত্র কামরা! যা আজও কেউ কখনও ব্যবহার করে নি? শাহ আবদালীর বাসর হবে!

উমধা—হাঁ, শাহ আবদালী সাদী করবে।

নসীবন—বেমারীতে আবদালীর নাকটা ব'সে গিয়েছে, শুনেছি দুটো কানই তার নেই, মাথার চুল সফেদ হয়ে এসেছে—সে সাদী করবে?

উমধা—হাঁ, হাঁ, বাদশাহী লালস, দৌলতী লালস, বয়স মানে না —বেমার মানে না। শাহ আবদালী সাদী করবে।

নসীবন—মা, তুমি কি বলছ বল তো?

উমধা—বুঝতে পারছিস না?

নসীবন—মা! (চীৎকার করিয়া উঠিল)

উমধা—আরে না, ভয় করিস নে বেটী। সে আমি হতে দেব না। আমার গুরু বলেছেন তোর নসীব গুনে—এই মেয়ের লগ্নে আছে রাজযোগ, এই মেয়ে করবে সাক্ষাৎ শয়তানের দর্পচূর্ণ। তোকে বসাব আমি দিল্লীর তক্তে। ভয় কি?

নসীবন—ভয় আমি করি না মা। মরণে আমার ভয় নেই। ভয় তোমাদের এই খেলাকে। এক পাগল ফকীরকে নিয়ে দিন-

রাত নসীব গুনছ আর তক্ত নিয়ে এক সর্বনাশা খেলার জাল বুনছ।

[বাহিরের দিক হইতে প্রবেশ করিলেন শাহ কানা নামক ফকীর। ইতিহাসে উল্লিখিত ব্যক্তি। ভাগ্যগণনায় প্রায় সিদ্ধপুরুষ। ফকীর উমধাবাঈয়ের গুরু। দিল্লীতে সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উত্তেজিতচিত্তে প্রবেশ করিলেন]

কানা—(বাহির হইতে) রাজমাতা উমধা বেগম! বেটী ফকিরিণী বেগম—নসীবন!

উমধা—হজরত! গুরু!

কানা—(বাহির হইতে) নসীবন কই? (প্রবেশ করিলেন) নসীবন!

নসীবন—মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমি দাঁড়িয়ে আছি হজরত।

কানা—না না, মৃত্যু নয়—মৃত্যু নয়। সে হবে না।

উমধা—তা হ'লে যে গুজব শুনে এলাম সে মিথ্যে? আবদালী যে শর্তনামা পাঠিয়েছে, সে দেখেছেন আপনি?

কানা—দেখেছি। আজিজুদ্দিন আলমগীর একরারনামা হাতে নিয়ে পুতুলের মত ব'সে আছে। একরারনামা নয়, আফগান বাদশাহের হুকুমনামা।

উমধা—কি তার দাবি?

কানা—যা শুনেছ তাই। তামাম পাঞ্জাব এলাকা, দু ক্রোড় টাকা, পানশও উট, পানশও খোরাসানী ঘোড়া, দুশও হাতী, চারশও বাঁদী আর দিল্লী হারেমের তিন শাহজাদী। আবদালীর বেটা তৈমুরশাহ আবদালী সাদী করবে আজিজুদ্দিন আলমগীর বাদশাহের বেটী গৌহরউন্নিসাকে! আর হুরিহুরানী আহম্মদ শাহ আবদালী চেয়েছেন মহম্মদ শাহের দুই বেটী—মালকাই জমানির বেটী হজরত বেগম আর উমধা বেগমের বেটী—

নসীবন—ফকিরিনী বেগম নসবন্নেসা ?

ফানা—হাঁ তাই। শয়তানী মুঘলানি বেগম লাহোর থেকে তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে তাকে দিল্লীর সমস্ত খবর যোগাচ্ছে। সে তাকে বলেছে, এই দুই শাহজাদী—দুনিয়ায় এদের তুলনা নাই। হুজরত বেগমের মত সুরত নাকি ইরান থেকে হিন্দোস্তান পর্যন্ত দুসরা নাই। আর ফকিরানী বেগমের সুরত আর নসীব দুইয়েরই জোড়া মেলে না। শাহ নাদীর দিল্লী হারেমের যে বিখ্যাত সুন্দরী আয়ফৎউন্নেসাকে বেটার বহু ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, যাকে নিকা ক'রে আবদালী নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে—সে আয়ফৎ এদের কাছে চাঁদের কাছে মিট্টীর চেরাগ!

উমধা—হাঁ! তাই রাহুর মত আবদালী আসছে সেই চাঁদকে গ্রাস করতে! না না, সে আমি দেব না হুজরত, সে আমি দেব না। নসীবন!

নসীবন—ভয় ক'রো না মা, আমি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, আমি মরব।

ফানা—না না না। সে হয় না, সে হবে না, সে তুমি পারবে না।

নসীবন—পারব না ? ফকীর সাহেব, আমারও উপর যেদিন বৃদ্ধ আজিজুদ্দিন বাদশার লালসা দৃষ্টি পড়েছিল, সেই দিনই তো আমি মরতাম। বিষ খেতে তো গিয়েছিলাম। আপনি, আমার মা আর চাচা মহি-উল-মিল্লাত আমাকে নিবৃত্ত করেছিলেন। নসীব গণনা ক'রে ভবিষ্যৎ রচনা করবার নেশায় তিনজনে মশগুল আপনারা। বলেছিলেন, অতি পুণ্যলগ্নে আমার জন্ম, আমার ভাগ্যে আছে নাকি বাদশাহী যোগ, আর আছে এক অমৃতযোগ, যার ফলে আমি পার নাকি

হিন্দু-মুসলমানের ভালবাসা, আমি নাকি পরাজিত করব সাক্ষাৎ শয়তানকে। আমি তক্তে বসলে আবার হিন্দুস্তানে শান্তি, বাবরশাহী বংশের ফিরে আসবে সেই পুরানো গৌরব। বলেছিলেন—বিশ্বাস কর। তাই সেদিন মরি নি। কিন্তু প্রলোভনে ভুলি নি। আপনাদের আশ্বাসে আশ্বস্ত হই নি। খোদা আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। পাঠিয়েছিলেন মৃত্যুদূতকে। মৃত্যুদূত আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল—ডর কি বেটী? আমি রইলাম তোর পাহারায়। তোর অন্ধ মা তোকে রক্ষা করতে পারবে না, ফকীর তোকে রক্ষা করতে পারবে না, কিন্তু আমি পারব।

উমধা—নসীবন! কার কথা বলছিস? সেই—সেই?

নসীবন—হ্যাঁ। সেই। সেই দেখবেন জনাব?

[সে আলোটি তুলিয়া লইয়া দেওয়ালের দিকে প্রসারিত করিল। দেখা গেল, দেওয়ালের গায়ে একটি প্রকাণ্ড গোক্ষুরা একটি গর্ত হইতে বাহির হইয়া আর একটি গর্তে প্রবেশ করিতেছে। এক গর্তে মুখ, অন্য গর্তে লেজ]

উমধা—নসীবন!

নসীবন—(কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া গেল) আমি বীণা বাজাই ও শোনে। ফাটল থেকে মুখ বার ক'রে দোলে।

[ঠিক সেই মুহূর্তে বাহির হইতে প্রবেশ করিল মহি-উল-মিল্লাত ও তাহার সহচর]

মিল্লাত—(প্রবেশ করিয়াই আলোর শিখা লক্ষ্য করিয়াই আতঙ্কে বলিয়া উঠিল) আ!

কানা—মিল্লাত! এসেছ তুমি? আঃ! বাঁচলাম। আর ভয় নেই।

নসীবন—(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল) আর আপনাদের অভয়ে

আমার বিশ্বাস নেই। ওর মুখে আমি হাত দেব। ওই আমাকে দেবে অনন্ত আশ্বাস।

উমধা—নসীবন! না না। বড় জ্বালা, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা রে!

নসীবন—মুঘল বংশের উপর অনেক অভিসম্পাত মা! অনেক জ্বালাই তো নসীবে থাকার কথা!

ফানা—মিথ্যে সময় নষ্ট ক'রো না মা। তোমায় নসীবে এখন মৃত্যুযোগ নেই। ওতেও তোমার মৃত্যু হবে না।

নসীবন—ওর বিষেও আমার মৃত্যু হবে না। হজরত, আপনার মগজ ঠিক নেই।

ফানা—নসীবের যাদুর মগজ দিয়ে কিনারা করা যায় না বেটী।

মিল্লাত—সাপের বিষকে হজরত অমৃতে পরিণত করতে পারেন বেটী।

ফানা—পারি। ও যদি তোমাকে আজ কামড়ায় তবে সে বিষ থেকে আমি বাঁচাতে পারব। কিন্তু সেও তো তোমার নসীবে নাই আজ। আমি যে আজই তোমার নসীব গুনেছি।

[নসীবন এবার দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়া সাপটার গায়ে হাত দিল]

মিল্লাত—(আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল) আ—, নসীবন—বেটী!

উমধা—(দাঁড়াইয়া উঠিল) নসীবন!

[নসীবন সাপটাকে স্পর্শ করিতেও সাপটা নড়িল না]

নসীবন—এ কি?

ফানা—নসীবের যাদু মা। দেখছ না সাপটা ম'রে গেছে। ওর মুখ ফাটলটায় রয়েছে, সেখান থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে, দেখছ না? ফাটলের একখানা পাথর খ'সে চেপে পড়েছে ওর মুখের উপর। কিছুক্ষণ আগে ধরতি কেঁপেছিল বুঝতে পেরেছিলে? তখনই—বোধ হয় তখনই নসীব এ খেল্ খেলে রেখেছে।

নসীবন—তবে? তবে আমার কি হবে?

ফানা—অধীর হ'য়ো না মা। তোমার নসীবে একটা কঠিন লগ্ন এসেছে। মৃত্যু নয়। শাদীর একটা আভাসও আছে। আবার স্বস্থানচ্যুত হওয়ার যোগও রয়েছে।

নসীবন—স্থানান্তর কি দিল্লী থেকে কাবুলে? ওই বৃদ্ধ বর্বর ব্যভি-চারীকে বিবাহ ক'রে কি আমাকে নসীবের খেলা সম্পূর্ণ করতে হবে? তক্তে বসার যোগ সফল করতে হবে?

ফানা—না না। লড়াই করব। তার জন্মে আমি লড়াই করব। আবদালীর সঙ্গে—দরকার হ'লে নসীবের সঙ্গে লড়াই করব আমি। তোমাকে রক্ষা আমাকে করতেই হবে। হিন্দোস্তানে মুসলমান বাদশাহীকে রাখতে হবে, বাঁচাতে হবে আমাকে। (আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া উদভ্রান্তের মত বলিয়া গেলেন) তামাম হিন্দোস্তানে নেমে আসছে আঁধিয়ারা। পূরব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ—সব ঢেকে যাচ্ছে। সবার আগে দেখিতে পাচ্ছি মুসলমান বাদশাহী কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে সেই আঁধিয়ারার মধ্যে কোথায় ভেসে চ'লে যাচ্ছে! আঃ! চোখ আমার জলে ভ'রে যাচ্ছে, আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ইসলামী বাদশাহী যদি যায়! (আর্তনাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন) হা! হা! না না, সে আমি যেতে দেব না। তাকে রাখব আমি। লড়াই করব আমি। তোমার নসীবে তোমার অঙ্গে খোদার দয়ার রৌশনের মত পবিত্র লক্ষণ খুঁজে পেয়েছি; জন্ম-লগ্নে আছে বাদশাহী যোগ, তোমার চরিত্রে আছে শয়তানকে হার মানাবার গ্রহসমাবেশের শুভ-দৃষ্টি। তোমাকে যদি সুলতানা ক'রে বসাতে পারি তবে জিতব। আজকের দুর্যোগ পার হতেই হবে।

নসীবন—কি ক'রে পার হবেন ফকীর? আবদালীর বাড়ানো হাতের মুঠো থেকে কি ক'রে রক্ষা করবেন আমাকে? মরণ হাত বাড়ালে অনুনয় করলে কখনও কখনও ফেরে। মরা মানুষ কখনও কখনও বাঁচে। কিন্তু শয়তান হাত বাড়ালে সে হাত শুধু ফেরে না হজরত!

ফানা—ফেরাতেই হবে উমধাবাঈ।

উমধা—হজরত!

ফানা—নসীবনকে আমি এই পাথরের কেল্লা থেকে বের ক'রে দুনিয়ার খোলা বাতাসে আকাশের নীচে মাটির বুকে ছেড়ে দেব।

উমধা—হজরত, আমি জন্মেছিলাম হিন্দুর ঘরে। হিন্দুরা মেয়েকে দরিয়ার জলে ভাসিয়ে দেয়, ভাবে, দেবতা নিলেন হাতে তুলে। আমি তাই ভাবব।

ফানা—ঠিক আছে বেটী। মিল্লাত!

মিল্লাত—হজরত!

ফানা—তুমি ঠিক সময়ে এসেছ। যোগাযোগ শুভ মনে হচ্ছে। আজ তিন দিন অপেক্ষা ক'রে ভেবেছিলাম—তুমি এলে না, আসতে পারলে না।

মিল্লাত—অনেক কষ্টে এসেছি হজরত। পথ ভুল ক'রে, আজ তিন দিন ঘুরছি।

ফানা—আজই এই মুহূর্তে তুমি নসীবনকে নিয়ে দিল্লী ছেড়ে চ'লে যাও। (বাহিরের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন) আশরফ!

[একজন দরিদ্র ব্যক্তি প্রবেশ করিল]

আশরফ আমার শিষ্য। নৌকার মাঝি। কিন্তু ধার্মিক। ওর

নৌকা বাঁধা আছে যমুনার ঘাটে। নির্ভাবনায় চ'লে যাও। আশরফ, ফরিদাবাদের ঘাটে নৌকা বাঁধবে। সেখানে থাকবে আমার শিষ্য মহবুব আলি ফকীর। সে তোমাদের নিয়ে যাবে দূর দেহাতে—আমার প্রথম জীবনের আস্তানায়। আবদালী যতদিন হিন্দোস্তান থেকে না যায়, ততদিন সেখানে থাকবে তোমরা। তারপর—তারপর খেলা শুরু করব আমি।

মিল্লাত—আমাকে যেতে বলছেন হজরত?

ফানা—হাঁ হাঁ। তোমার নসীবে আছে তুমি বসবে তক্তে। এ সতরঞ্চি খেলায় তুমিও আমার ঘুঁটি। তোমাকে আমি প্রথমে বসাব তক্তে। তারপর তোমার উত্তরাধিকারিণী হয়ে বসবে নসীবন। নইলে প্রথমেই সুলতানাকে তক্তে বসাতে গেলে অনেক—অনেক আপত্তি হবে।

নসীবন—হজরত!

ফানা—বেটী!

নসীবন—কিন্তু সেখান পর্যন্ত যদি আবদালীর হাত যায়?

ফানা—(চমকিয়া উঠিল) সেখান পর্যন্ত যদি আবদালীর হাত যায়?

নসীবন—হ্যাঁ, যদি যায়?

ফানা—দাঁড়াও (মাটিতে বসিয়া দাগ কাটিয়া কিছু গণনা করিল ও পরে উপরের দিকে চাহিল)।

নসীবন—হজরত!

ফানা—সব আঁধিয়ারা বেটী। কিছু বুঝতে পারছি না।

নসীবন—বলুন হজরত, আমি কি করব?

উমধা—মরবি। বেটী, আমি মা হয়ে বলছি—তুই মরবি। মিল্লাত, তুমি ওকে খুন ক'রো।

মিল্লাত—হজরত!

ফানা—হাঁ, তুমি ওকে খুন ক'রো। নসীবন, তুমি মরতে চেষ্টা ক'রো।

[নেপথ্যে দুপহরের ঘড়ি বাজিতে লাগিল]

আশরফ—হজরত! দুপহর পার হয়ে গেল।

ফানা—মিল্লাত, নসীবন! চ'লে যাও, আর দেরি ক'রো না।

নসীবন—(মায়ের কাছে গেল) মা!

উমধা—চ'লে যা বেটী। আমার দিকে তাকাস না। চ'লে যা।

ফানা—যাও নসীবন, চ'লে যাও।

নসীবন—চলুন, আমি তৈয়ার।

[মিল্লাত, নসীবন ও আশরফের প্রস্থান]

[সেই যন্ত্রসঙ্গীতের মত ক্রন্দনধ্বনি বাজিয়া উঠিল]

ফানা—উমধাবাঈ!

উমধা—হজরত!

ফানা—শুনছ? দিল্লী কাঁদছে!

উমধা—শুনেছি। এই মাসেই আমার মৃত্যু হবে না হজরত?

ফানা—হাঁ। উঁচু জায়গা থেকে প'ড়ে তুমি মরবে। সম্ভবত আবদালী নসীবনকে না পেয়ে তোমাকে কেল্লার নীচে ফেলে দেবে।

উমধা—এয় খোদা!

ফানা—আফশোস ক'রো না উমধা। কিসের আফশোস? শোন, দিল্লী কাঁদছে শোন।

[যন্ত্রসঙ্গীতের মত ক্রন্দনধ্বনি ক্রমশ উচ্চ হইতে লাগিল]

[পরবর্তী দৃশ্যপট অন্ধকারের মধ্যে আবৃত করিল]

তৃতীয় দৃশ্য

মথুরা হইতে কয়েক মাইল উত্তরে যমুনা-তীরবর্ত্তী বনপথ।

[আবছা অন্ধকারাবৃত স্থান। পূর্ববর্তী দৃশ্যের যন্ত্রসঙ্গীত দৃশ্যান্তরের মধ্যেও বাজিয়া আসিতেছিল। যেন একটানা একটা কান্নার সুর বাজিয়া চলিয়াছে। দৃশ্যাভিনয় শুরু হইল—ওই যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতে পরিণত হইল। যমুনার বুকে নৌকা হইতে গান ভাসিয়া আসিল। প্রথম চরণ গীত হইবার পরই প্রবেশ করিল দুইজন বিস্ময়াভিভূত রোহিলা পাঠান রিসালা অর্থাৎ সৈনিক। হাতে খোলা তলোয়ার, পিঠে লম্বা নল-বন্দুক। তাহারা সন্তর্পিত পদক্ষেপে প্রবেশ করিল—চারিদিক খুঁজিতেছিল]

১ম জন—(শঙ্কাভিভূত ভাবে বলিয়া উঠিল) আ—! এ কেয়া হ্যায়? রোতি হ্যায়?

২য় জন—(তাহার হাত টিপিয়া বলিল) ডরো মৎ।

১ম জন—দিল্লী রোতি হ্যায়?

২য় জন—চুপ।

১ম জন—হিন্দোস্তান রোতি হ্যায়?

২য় জন—(এবার তাহাকে ঝাঁকি দিয়া) এঃ, তুম্ সিপাহী হ্যায়?

১ম জন—(সম্বিত পাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল) আঁ!

২য় জন—চুপ রহো। (আঙুল দেখাইয়া বলিল) রোতি নেহি। গীত!

১ম জন—গীত!

২য় জন—শুনো, কোন আওরৎ গান গাইছে।

[দুইজনে গান শুনিল]

[গান শেষে দ্বিতীয় জন আঙুল দেখাইয়া বলিল]

২য় জন—উও পানসী! শেষ রাত্রের মরা চাদনীতে নজরে আসছে?

উহু! রোদন না—গীত। দেও না, দানা না—মানুষ। বহুৎ এলেমদারনী কেউ গাইছে।

১ম জন—তাজ্জব মিঠি গলা!

২য় জন—শীতকালের শেষ রাত, দুনিয়া ঠাণ্ডিতে আর ঘুমে বেহোঁশ হয়ে গেছে ভেবে দেওয়ানা গীত গাইছে। পানসী চলেছে—পশ্চিম থেকে পূবে। জরুর দিল্লীর পানসী। রুখ্ পানসী, ফুকার—

১ম জন—এ—! এ—পানসীওয়ালে—! এ—! আরে—!

২য় জন—হো পানসীওয়ালে—রোখো পানসী। হো—!

[তলোয়ার পুরিয়া পিঠ হইতে সে বন্দুক টানিয়া লইল]

১ম জন—ভাগছে। জোরে চলছে পানসী।

২য় জন—(বন্দুক তুলিয়া) চালাও বন্দুক।

[দুইজনেই বন্দুক তুলিয়া ধরিয়া বন্দুক ছুড়িল। মুহূর্ত পরে পরে দুইটি শব্দ হইল]

১ম জন—(লাফাইয়া উঠিয়া) উয়ো! গিরেছে আদমী দরিয়াতে! চলো জল্‌দি।

[দুইজনেই ছুটিয়া চলিয়া গেল]

[পিছন হইতে প্রবেশ করিল—একজন দেশোয়ালী জোয়ান। প্রথম দৃশ্যের জাঠ চাষীর ছেলে। এখন তাহার পিঠে ঢাল ও বন্দুক, কোষে তলোয়ার। সেও রঙ্গমঞ্চের এ প্রান্তে আসিয়া বন্দুক লইল। পিছন দিকে চাহিল, নেপথ্যে কাহাকেও দেখিয়া বলিল—]

জাঠ যুবক—হে—ই!

[প্রবেশ করিল আর একজন জাঠ]

১ম জাঠ যুবক—খবর? কারা ওরা জঙ্গলে নিদ যাচ্ছে?

২য় জাঠ যুবক—রোহিল্লা নাজিবখাঁর পাঠান পল্টন।

১ম জাঠ যুবক—কত জন ?

২য় জাঠ যুবক—দু শও—তার জাস্তি না।

১ম জাঠ যুবক—হাতিয়ার কি ? তোপ ? তোপ আছে ?

২য় জাঠ যুবক—দুটো হাল্কা তোপ। বাকি বন্দুক—বর্শা—তলোয়ার।

১ম জাঠ যুবক—বাস্। লুঠ। পহেলেই দখল করো তোপ। আওয়াজ না, চিতার মত লাফিয়ে প'ড়ে চালাও তলোয়ার। জল্‌দি ! ভোর হয়ে আসছে।

[আবার নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ হইল]

১ম জাঠ যুবক—দুটো পাঠান একটা পানসীর উপর গুলি চালাচ্ছে। আমি দেখছি। তোরা ভাইয়া, জল্‌দি। সাফা কর্ দো। দেখো, এককো ঘোড়া না মরে !

[দ্বিতীয় জন চলিয়া গেল। প্রথম জন বন্দুক তুলিয়া দ্রুত আগাইয়া গেল]

নেপথ্যে রোহিলা—রোখো পানসী।

নেপথ্যে মিল্লাত—হে খোদা ! হে খোদা !

[পর পর দুইবার বন্দুকের শব্দ হইল]

নেপথ্যে ১ম জাঠ—জয় মথুরানাথ ! আ !

নেপথ্যে মিল্লাত—হে খোদা !

নেপথ্যে ১ম জাঠ—ভয় করো না মুসাফের। আমি ডাকু নই। উতারো—জলদি উতারো। জলদি !

চতুর্থ দৃশ্য

মথুরার সন্নিকটস্থ মহাবন গোকুল তীর্থ

গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম।

[একটি গাছতলায় বেদীর উপর বসিয়া আছেন নরিন্দরগিরি গোস্বামী মহারাজ। ইতিহাস-বিখ্যাত মহাযোদ্ধা স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগিরি মহারাজের প্রধান শিষ্য ও গিরি-সম্প্রদায়ের প্রধান। যোগদণ্ডের উপর ভর দিয়া তিনি বসিয়া আছেন। গায়ে তুলা-ভরা মোটা কুর্তা, মাথায় কান-ঢাকা টুপির উপর গেরুয়া কাপড়ের শিরবন্ধ। গলায় কাঠের মালা। হাতে বাহুতেও মালা। এক দিকে ত্রিশূল গাড়া রহিয়াছে, অন্য দিকে সযত্নে রক্ষিত খোলা তলোয়ার। বেদীর দুই পাশে কাঠের স্থায় দড়ির ছাউনি দুইটি আসন। নরিন্দরগিরি একটি বন্দুক লইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছিলেন।

'নমো নারায়ণ' বলিয়া প্রবেশ করিলেন একজন দীপ্তিমান পুরুষ। দেখিয়া বুঝা যায় মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ; কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, কানে টাপের মত কর্ণভূষা, হাতে গুপ্তি লাঠি ; পরিধানের বেশ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত। তিনি ছদ্মবেশী মারাঠা পেশবা—বালাজী বাজিরাও]

বালাজী—নমো নারায়ণ! নমস্তে গিরি মহারাজ!

গিরি—(হাত তুলিয়া) নমো নারায়ণ! আরে ভাই রাওজী পণ্ডিত! এস এস এস। ব'স ভাই। (আসন দেখাইয়া দিলেন। বালাজী বসিলেন) তীর্থভ্রমণ হয়ে গেল? ফিরলে কবে?

বালাজী—এই পথে পথে ফিরছি মহারাজ। আপনার আশ্রমের দরজায় ঘোড়া ছাড়লাম।

গিরি—আনন্দ রহো ভাই, আনন্দ রহো। তারপর কি দেখে এলে বল!

বালাজী—দেখা হ'ল না মহারাজ ; আবদালী আহমদ শাহ তৃতীয়বার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছে। আটক থেকে সরহিন্দ পর্যন্ত শত শত ক্রোশ পথের দুপাশ শ্মশান হয়ে গেছে। মানুষ নাই,

মরেছে—নয় পালিয়েছে। মাটি নাই, ছাইয়ে ঢেকে গেছে ; গ্রাম পুড়ে গেছে, শহর এখনও পুড়ছে। এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে মশাল নিয়ে ঢুকেছে আফগান।

গিরি—হাঁ হাঁ পণ্ডিত, ওই—ওই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম তোমাকে। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করে পণ্ডিত, মন্দিরে পাথরের বিগ্রহে দেব-দর্শন তো তাদের নয়। আমি বলছি, গ্রাম পোড়া শহর পোড়া দেখে এলে চোখে ?

বালাজী—চোখে দেখি নি। প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছি।

গিরি—হায় হায় পণ্ডিত! করেছ কি ? এমন জ্বালামুখী তীর্থ, দেখে পুণ্য সঞ্চয় ক'রে এলে না ? কোন্ পুণ্যে তোমরা হিন্দু পাদ পাদশাহ প্রতিষ্ঠা করবে রাওজী! অগ্নিমুখ দৈত্য জালন্ধর আবার মুক্তি পেয়ে যে আগুন জ্বালিয়েছে, সে আগুন চোখে না দেখলে অন্তরের আনন্দময় শঙ্কর রুদ্ররূপে জাগবে কেন পেশবা ?

বালাজী—গোস্বামীজী! (চকিত হইলেন)

গিরি—পেশবা! (হাসিলেন)

বালাজী—কাকে কি বলছেন ?

গিরি—তোমার ওই চোখ দুটি তোমাকে ধরিয়ে দেয় পেশবা। পেশবা বালাজী রাওয়ের চোখের তারা দুটো মধ্যে মধ্যে স্থির হয়ে যায়। ভূত ভবিষ্যতের অন্ধকার আর কুহেলিকা ভেদ করতে চায় যেন যুগল শুক্রগ্রহের মত। তোমার বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাকুল ললাটের সারি সারি ওই রেখায় মহিমা ত্রিপুণ্ড্রকের ভস্মলেপনে ঠিক ঢাকা পড়ে না বালাজী রাও।

বালাজী—আপনাকে নমস্কার গিরি মহারাজ। কিন্তু ও-নামে আমাকে সম্বোধন করবেন না।

গিরি—ঠিক হ্যায় ভাই, ঠিক হ্যায়। তাই হবে। পণ্ডিতজী! রাওজী! (হাসিলেন)

বালাজী—তা হ'লে আমার কথায় জবাব দিন। দু মাস আগে যাবার সময় আপনাকে নিবেদন জানিয়েছিলাম, আপনি বলেছিলেন—পরে জবাব দেবেন। সেই জবাবের জন্যই ফেরার পথে আমি এসেছি। নইলে আমি দেখে এসেছি আহমদশা আবদালী দিল্লী প্রবেশ করেছে। মহম্মদশাহের কন্যা ফকিরিণী শাহজাদী হজরত বেগমকে সে বিবাহ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে কন্যা বিচিত্র-ভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে। আবদালী শিকার-কেড়ে-নেওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে দিল্লী শহর বিপর্যস্ত ক'রে দিয়েছে। শুনে এসেছি সে দিল্লী থেকে বাহিনী নিয়ে গোটা দেশ খুঁজবে। আমার সময় নেই গোস্বামীজী। নাজিবখাঁর রোহিল্লা সওয়ারের ছোট ছোট দল বেরিয়ে পড়েছে। আমার নিবেদনের উত্তর দিন।

নরিন্দর—কি উত্তর দেব পণ্ডিতজী ?

বালাজী—উত্তর-ভারতে আপনাদের গিরি-সম্প্রদায়ের অসীম আধিপত্য। লোকে বলে, শক্তিতে আপনারা অপরাজেয়। আপনাদের স্বর্গীয় গুরু রাজেন্দ্রগিরি গোস্বামী ছিলেন ভীষ্মের মত যোদ্ধা। আপনি নিজে মহাযোদ্ধা; রণপণ্ডিত। আপনার পাঁচ হাজার গোস্বামী সৈন্য নারায়ণী সেনার মত দুর্ধর্ষ। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী অনুপ-গিরি গোস্বামী অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করছেন; আমার নিবেদন—মারাঠার এ উদ্যমে হিন্দু পাদ পাদশাহী স্থাপনে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

নরিন্দর—এইবারেই কি তোমরা আবদালীকে বাধা দিয়ে তার শুভারম্ভ করবে পণ্ডিত ?

বালাজী—না গোস্বামীজী, এবার নয়।

নরিন্দর—এত বড় অত্যাচার হত্যাকাণ্ড বর্বরতায় বাধা দেবে না ?

বালাজী—এখনও সময় হয় নি গিরি মহারাজ। এখন আমরা বাধা দিতে গেলেই আফগান মুঘল এক হয়ে যাবে। এদিকে হিন্দু রাজারা আমাদের পিছন থেকে আঘাত করবে। আবদালী এবার মুঘল শক্তিকে ধ্বংস ক'রে যাক, তার নিষ্ঠুরতায় তাদের মন আফগানের উপর বিরূপতায় ভ'রে উঠুক। ওদিকে আমরা হিন্দুরাজাদের আয়ত্তে আনা শেষ করি। তারপর অগ্রসর হব। তখন আমার বিশ্বাস, আবদালী আর অগ্রসর হতে সাহস করবে না। যদি করে, তবে নির্মম আঘাতে তাকে ফিরিয়ে দেব।

নরিন্দর—ভাল ভাই পণ্ডিত। আর একটা প্রশ্ন করব। আমি বুঝতে পারছি না।

বালাজী—বলুন।

নরিন্দর—তোমার হিন্দু পাদ পাদশাহী হ'লে আমি—

বালাজী—আপনাকে আমি হিন্দুর ধর্ম-জগতের শিরোভূষণ ক'রে দেব জগৎগুরুর মত আপনার আসন হবে। অনুপগিরিকে আপনার অধীন হয়ে থাকতে হবে।

নরিন্দর—(হাসিয়া উঠিলেন) আরে, না না না ভাই। সে কথা আমি বলি নি। গুরুর আসন শিষ্যে দেয় পণ্ডিত, রাজা তা দিতে পারে না। আর আমার সে কামনাও নাই। আমি বলছি ভাই—আমি বুঝতে পারছি না, তোমারই বা কি হবে ? দেশেরই বা কি হবে ?

বালাজী—(অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ঈষৎ তিক্ত চিত্তেই বলিলেন) হবে বই কি গোস্বামীজী, কিছু অবশ্যই হবে। ঈশ্বরকে পেলে আপনার যা হয় আমার হবে তাই। দেশেরও কিছু শান্তি ফিরবে।

নরিন্দর—(প্রশ্নের সুরেই বলিলেন) শান্তি ফিরবে দেশে! কয়েক মুহূর্ত ভাবিলেন) হবে ভাই রাওজী। তোমার মত পণ্ডিত যখন বলছে তখন হয়তো ফিরবে।

বালাজী—সন্দেহ হচ্ছে আপনার?

নরিন্দর—হচ্ছে। সবাই যখন অশান্ত ভাই, তখন সবাইকে শান্ত করতে না পারলে তো শান্তি ফিরবে না ভাই। সবাইকে শান্ত করার পথ তুমি পেয়েছ পণ্ডিত?

বালাজী—অশান্তির সৃষ্টি যারা করছে তাদের আমি কঠিন শাসনে দমন করব। সাধারণ মানুষ আপনি শান্ত হবে।

নরিন্দর—হ্যাঁ। তা পারবে। তা তুমি পারবে। কিন্তু ভাই, মারাঠা যে অশান্তির সৃষ্টি করে, তাকে রোধ করবে কে? সে তো অশান্তি কম করে না ভাই। লুঠ, ঘর-জ্বালানো, মানুষের অঙ্গচ্ছেদ—সবই করে সে। দোয়াবে যদি তুমি তীর্থ পরিক্রমা ক'রে থাক, তবে নরদেবতার ভগ্ন মন্দির অঙ্গহীন বিগ্রহ তো তুমি দর্শন করেছ পণ্ডিত!

বালাজী—মারাঠার অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তার রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হবে গোস্বামীজী।

নরিন্দর—রাষ্ট্রনীতি! তবেই তো গোল লাগালে ভাই রাওজী! শান্তি তো হ'ল না ভাই!

বালাজী—কেন গিরি মহারাজ?

নরিন্দর—উঁহু। আরে ভাই, আমি যা জানি, তাতে এক ধর্ম ছাড়া শান্তি হয় না।

বালাজী—(সবিস্ময়ে) ধর্ম ছাড়া শান্তি হয় না? সংসারে তো ধর্মের সংখ্যা নাই মহারাজ, তবে—

নরিন্দর—না ভাই; সে ধর্ম নয়। সত্য ধর্ম। পণ্ডিত, ধর্ম ছাড়া শান্তি

নাই, ন্যায় ছাড়া ধর্ম নাই, সত্য ছাড়া ন্যায় নাই। তাই সত্য হ'ল একমাত্র ধর্ম, ওতেই আছে শান্তি, ওতেই আছে সুখ, ওতেই মানুষের মুক্তি। তোমার রাষ্ট্রনীতিতে সত্য বর্জিত। কৌটিল্য বলেছেন, মনোভাব গোপনই অর্থাৎ প্রকারান্তরে মিথ্যাশ্রয়ই রাষ্ট্রনীতির মূল কথা। ওতে সত্যও নাই, ন্যায়ও নাই, ধর্মও নাই।

বালাজী—ধর্ম সবার এক নয় মহারাজ। রাজার ধর্ম এক, প্রজার ধর্ম অন্য। মহারাজ, আপনাদের গুরু ও শিষ্যের ধর্মও এক নয়।

গিরি—ঝুট ঝুট ঝুট পণ্ডিত। সত্য কথা বলা রাজারও ধর্ম, প্রজারও ধর্ম, গুরুরও ধর্ম, শিষ্যেরও ধর্ম—সব মানুষের ধর্ম। সত্যই তাই হ'ল সনাতন ধর্ম।

বালাজী—প্রজার মিথ্যাবোধের দাবিকে রাজাকে মানতে হয় গিরিজী, রামচন্দ্রকেও সতী সীতাকে বনবাস দিতে হয়েছিল। আপনাদের চোখের সামনে, গিরিজী, সত্য ভগবানকে বোঝাতে পাথরের মন্দির গ'ড়ে লক্ষ লক্ষ বিগ্রহের মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে।

গিরি—হাঁ হাঁ পণ্ডিত, যা মিথ্যা—তা মিথ্যা। সেই সব মিথ্যাকে সত্যের নামে গ্রহণ করার জন্তেই জ'মে উঠেছে এত জঞ্জাল। সব—সব—দূর করবে, কালই তোমার হিন্দুপাদ পাদশাহী তা করবে?

বালাজী—গিরি মহারাজ! আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী?

গিরি—পণ্ডিত, সন্ন্যাস মানে সব ত্যাগ—বর্জন। জাতি, কুল, ধরম—সব—সব। এক সত্য ছাড়া সব। ইহকাল, পরকাল, ভূর্লোক, ভুবর্লোক—

(নেপথ্যে নাকাড়া সিঙ্গা বাজিয়া উঠিল)

গিরি—(তলোয়ার লইয়া অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া ঘুরিয়া তাকাইলেন)

বালাজী—কি হ'ল ? নাকাড়া ? কিসের নাকাড়া ?

গিরি—ব'স ব'স, রাওজী ভাই।

বালাজী—আবদালীর অভিযানের উদ্যোগ আমি দেখে এসেছি গোস্বামীজী।

গিরি—মহিন্দর গিরিমহারাজ !

[মহিন্দরগিরির প্রবেশ—হাতে তলোয়ার]

মহিন্দর—গুরু মহারাজ ! নাকাড়া বেজেছে।

গিরি—কিসের নাকাড়া ? কোথায় বাজল ?

মহিন্দর—যমুনার কূলে কূলে নাকাড়া বেজে বেজে চ'লে আসছে। গাঁয়ে গাঁয়ে বাজছে। আগে নাকাড়ার শব্দ পেয়ে আমরা নাকাড়ায় ঘা মেরেছি।

গিরি—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন) শঙ্কর ! শঙ্কর !

[বালাজীও উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

বালাজী—(হাসিয়া) কাকে ডাকছেন গোস্বামীজী ?

গিরি—অন্তরের রুদ্রকে জাগাচ্ছি রাওজী। (হাসিলেন) তুমি চ'লে যাও রাওজী। আফগান আসছে—তাতে সন্দেহ নেই।

বালাজী—আপনার সৎসঙ্গে যখন তীর্থপুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ মিলে গেল, তখন সে পুণ্য সঞ্চয় না ক'রে আমি যাব না।

গিরি—(হাসিয়া উঠিলেন) বহুৎ আচ্ছা পণ্ডিত। পুণ্য তোমার অক্ষয় হোক ! তুমি ওই মন্দিরের দরজায় থাক। বিগ্রহ রক্ষা কর। দেখ, মিথ্যা সত্য হয়ে ওঠে কি না !

[ছুটিয়া আসিল একজন সন্ন্যাসী]

সন্ন্যাসী—বল্লভগড়। জাঠ সুরযমলের বল্লভগড়ে তোপ দাগছে শাহ আবদালী। জেহানখাঁ আর নাজিবখাঁ ছুটে আসছে মথুরার দিকে।

গিরি—শঙ্কর! শঙ্কর!

[অগ্রসর হইলেন। তাহার পূর্বে বন্দুক পিঠে ঝুলাইলেন। কাঁধে লইলেন বারুদের ঝুলি। নাকড়া বাজিতেছে]

পঞ্চম দৃশ্য

[জাঠ গ্রাম চৌমুহা। নাকাড়া বাজিতেছে বাহিরে। বৃদ্ধ জাঠ সর্দার রঘু জাঠ প্রবেশ করিল। সে ক্রুদ্ধস্বরে বকিতেছে তাহার স্ত্রীকে। বন্দুকের নল পরিষ্কার করিতেছে। জাঠ পুরুষেরা দুইজনে হাল্কা কামান ঠেলিয়া লইয়া গেল। কয়েকটি মেয়ে ঝুড়িতে ছোট গোলা ও পিঠে বস্তায় বারুদ লইয়া গেল]

রঘু জাঠ—আরে, কেঁও রোতি হ্যায়? আরে, তুই কাঁদবি কেন? এ—এ বুঢ়ীয়া ভঁইষী!—মর্ যা, তু মর্ যা। ডরকে মরে বুদিয়া তু রোতি হ্যায়!

(রঘুর স্ত্রীর প্রবেশ

স্ত্রী—আরে, ডরকে মরে আমি কাঁদছি? বুঢ়া ভাল্লু একমুখ দাঁড়ি গোঁফ নিয়ে নিজেকে বুঝি সিংহী ভাবছিস তুই! (হাত তুলিয়া) এই হাতের কাঁকনির ঘায়ে তোর মুখ খুড়ে দোব আমি।

রঘু—আরে মিথ্যে বোলনেওয়ালী ঝগড়াটে বুড়ী! তুই ভাবছিস তোর মুখ ঝামটানিতে আমি বোকা ব'নে যাব? ভয়ে কাঁদছিস না? নিজের জানের ভয়ের কথা বলছি না। বেটা জবাহিরের জন্তে ভয়ে কাঁদছিস না? আবদালী দিল্লীতে মানুষ খুন ক'রে শ্মশান বানিয়ে দিয়ে বল্লভগড় পর্যন্ত এগিয়ে এল, দেশের আমির ওমরা

শেঠ গৃহস্থী ভিখিরী পালিয়ে এসে দেশ ছেয়ে ফেললে, আজও জবাহির এল না—এই কথা তুই বলিস নি আমাকে? বলিস নি আমাকে—কেন তুমি তাকে এই সময়ে দানা বেচতে দিল্লী পাঠালে?

[একটি মেয়ে ঝুড়িতে গোলা লইয়া যাইতে যাইতে গোলা পড়িয়া গেল। রঘুর স্ত্রী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গেল]

স্ত্রী—আরে মেইয়া, আরে বেটী! ফেললি? প'ড়ে গেল? ব'স্ ব'স্, তুলে দি আমি।

[মেয়েটি বসিল। রঘুর স্ত্রী কুড়াইয়া তুলিয়া দিল]

রঘু—(বন্দুক সাফ করিতে করিতে আপন মনেই বকিয়া গেল) আরে, সে হ'ল জাঠ জোয়ান, রঘু জাঠের বেটা সে, তার নাম জবাহির জাঠ! দশখানা গাঁওয়ে তার পাঞ্জা ধরবার মত জোয়ান নাই। তার তলোয়ারখানা ইস্পাহানী ইস্পাতের আড়াই হাত লম্বা, মাদ্রাজী ফিরিঙ্গির বন্দুক তার পিঠে। খোরাসানী ঘোড়া আছে সঙ্গে, আর আছে বাট বাট জাট জোয়ান। ক্ষেতিতে কাম করা পথলের দেহ তাদের। কোন্ দুশমন কি করবে?

[মেয়েটি এইবার চলিয়া গেল]

স্ত্রী—আরে জুঠেরা অধরমী, আমি তার জন্তে কাঁদি নি।

রঘু—ফের তুই 'জুঠেরা অধরমী' বলছিস বুড়ী! তোকে না বারণ করেছি!

স্ত্রী—তোর বারণ আমি শুনব কেন? ছিলি চাষী জাঠ, জুঠেরা বনিস নি তোরা? জুঠ করিস না তোরা? চাষী জাঠ কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বেড়াস না হরদম?

রঘু—(বন্দুক পিঠে ঝুলাইয়া) করি, করি, করি। খুব করি, বেশ করি। দোব এই লকড়ির বাড়ি, দেখবি! লুঠেরা আমরা, লুঠ করি! কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়েছি আমরা! তলোয়ার না নিলে আজ এমন ক'রে তোকে আমার সামনে মুখ নেড়ে কথা বলতে হ'ত না। কোন্ দিন তোকে চুলের মুঠি ধ'রে নিয়ে গিয়ে আফগান কি বাদাকশাহী কি রোহিল্লা কি বাদশাহী লুঠেরারা কোন্ হাটে কি শহরে দো তিন কি চার রূপেয়া দামে বেচে দিত। করতিস কারও বাড়িতে বাঁদীগিরি। লুঠেরা! আমরা লুঠেরা! আমরা অধরমী!

স্ত্রী—না না। বহুধরমী, ধরমবীর তোরা। আফগান আসছে, তোরা সব লুঠেরা তোপ নিয়ে, বন্দুক নিয়ে গাঁও বাঁচাবার জন্যে তৈয়ার হচ্ছিস! ওরে অধরমী, আকাশের পানে তাকাস কখনও? তাকা তো দেখি! যদুবর—কিষেণচাঁদ—মথরানাথের মন্দিলের চূড়া নজরে পড়ছে না? ওরে, ব্রজরাজকে বাঁচাবে কে রে? লুঠেরা আফগান এলে কি ওই রাজার ভাণ্ডার ছেড়ে তোর এই গাঁওয়ে দামড়ি লুঠতে আসবে? আমি কাঁদছি সেই জন্যে। সেই চাঁদমুখ মনে পড়েছে আর কাঁদছি। দুরানী আফগান আমার মথরানাথকে টেনে নামাবে—

[রঘু জাঠ মাথা নাড়া দিয়া বিকারগ্রস্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল]

রঘু—না—না—না—

[ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই উপর হইতে কোন গাছের মাথা হইতে পর্যবেক্ষক জাঠ যুবক চীৎকার করিয়া উঠিল]

পর্যবেক্ষক—হুঁশিয়ার—হুঁশিয়ার!

[সতর্কবাণী রঘুর কানে গেল না। প্রবল উত্তেজনায় প্রচণ্ড বেগে কোশ হইতে তলোয়ার বাহির করিয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিল। 'না—না—না'র সঙ্গেই যোগ রাখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—জয় মথরানাথ!]

পর্যবেক্ষক—ছোট এক দল সওয়ার; জোর কদমে চ'লে আসছে। আরে বাপ!

রঘু—মথরা—মথরা—মথরা! হে-হে জাঠ জোয়ান!

পর্যবেক্ষক—পাঁচ সওয়ার। এসে পড়ল। সর্দার!

রঘু—হে জাঠ জোয়ান! তোলো ঘাঁটি, উঠাও তোপ। আগে বাঢ়ো। মথরা—মথরা!

পর্যবেক্ষক—জবাহির! জবাহির! হে জবাহির!

নেপথ্যে জবাহির—হে—

রঘুর স্ত্রী—(চীৎকার করিয়া উঠিল) জবাহির!

[সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল জবাহির—তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম জাঠ যুবক। তাহার পিছনে মিল্লাত ও নসীবন বেগম। জবাহির আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল]

রঘু—(চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্নের সুরে বলিল) জবাহির?

জবাহির—মা!

রঘু—জবাহির! (আগাইয়া আসিতে পা বাড়াইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল মিল্লাত ও নসীবনকে দেখিয়া) এ কে? জবাহির!

জবাহির—(মাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল) কে জানি না। রোহিল্লা পাঠান এদের লুঠে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি।

রঘুর স্ত্রী—(বিস্মিত হইয়া নসীবনকে দেখিতেছিল। সে মুগ্ধ হাস্য-উদ্ভাসিত মুখে আগাইয়া গিয়া নসীবনের চিবুকে হাত দিয়া বলিল) রাধারাণী! হা—! মেয়ে শ্যামপিয়ারী! দুনিয়া-ভুলানী রূপ, এ আমার রাধারাণী।

[নসীবন দুই পা পিছাইয়া গেল]

মথুরানাথের জন্যে ভাবনায় আকুল হয়ে ছুটে এসেছে মহারাণী।

মিল্লাত—না না মায়ী। আমরা মুসলমান।

[রঘুর স্ত্রী নসীবনের হাত ধরিয়া ছিল। নসীবন হাত টানিয়া লইয়া আরও পিছাইয়া গেল]

জবাহির—ফকীর সাব আপনি? আপনি কি দিল্লীর সেই ফকীর? (নসীবনকে) তুমি কি সেই?

নসীবন—না না না।

রঘুর স্ত্রী—হাঁ হাঁ হাঁ। নতুন জনম নিয়েছ—মুসলমানী দেওয়ানা হয়ে জনম নিয়েছ। দেখেই চিনেছিলাম—তুমি রাধারাণী।

নসীবন—(তিক্তভাবে মাথা নাড়িয়া) জনাবালি! এখান থেকে চলুন—এখান থেকে চলুন। এখানে থাকতে আমি পারব না।

মিল্লাত—(জবাহিরকে চিনিতে পারিলেন না) জাঠ জোয়ান, খোদা তোমার মঙ্গল করবেন। যা করেছ, সে কখনও ভুলব না।

জবাহির—না না না আমীর। রাধারাণীকে বাঁচিয়েছি—সে আমার ভাগ্য। কোনও ভয় করব না। আসুক আবদালী, আমরা রুখব। রাধারাণী, তোমার মথুরানাথকে আমরা বাঁচাব।

নসীবন—না না। এ আমি সহ্য করতে পারব না।

রঘু—ভয় নাই মাতাজী। কোনও ভয় নাই তোমার। রঘু সর্দারের তাঁবে পঞ্চাশখানা গাঁওয়ের দশ হাজার জাঠ।

রঘুর স্ত্রী—ভয় ক'রো না মহারাণী। আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব। ঘন জঙ্গল গোকুল মহাবন—আমরা সব মেয়েরা যাব সেখানে। সেখানে তোমাকে লুকিয়ে রাখব। এমন পাহারা দোব তোমাকে—। (হাসিল)

পর্যবেক্ষক—সর্দার, বল্লভগড় পুড়ল। আগুন জ্বলছে, ওঃ—আরে, বাপ রে বাপ—গোটা আকাশ কালো হয়ে গেল! সর্দার!

রঘু—যেখানে গিরি গোঁসাইদের আট হাজার গোঁসাই আশ্রম বেঁধে রয়েছেন। হিন্দুস্থানের রুদ্রদেওয়ের সিদ্ধ ভক্ত—সিংহের মত সাহসী রাজেন্দ্রগিরি গোস্বামীর নাম শুনেছ? তাঁরই দল। নরেন্দ্রগিরি গোঁসাই মোহান্ত এখন। সেখানে চ'লে যাও।

মিল্লাত—রাজেন্দরগিরি গোঁসাই! তার শিষ্য নরিন্দরগিরি?

রঘুর স্ত্রী—আরও আছে। আরও আছে আমীর। গোকুলনাথ—গোকুলনাথ আছে। এস মহারাণী।

[নগীবনের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল]

মিল্লাত—চল চল বেটী, তাই চল।

[তাহারা চলিয়া যাইবামাত্র বন্দুকের আওয়াজ হইল]

জবাহির—(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল) হে—

পর্যবেক্ষক—আসছে। আসছে। আসছে।

রঘু—(নাকাড়া পিটাইতে লাগিল) আগে বাঢ়ো ভাই। আগে বাঢ়ো ভাই। জাঠ জোয়ানো মরদানা কো শেরো,—রুখো দুশমনো কো। ফাড় দো ছাতিয়া। হাঁকো ভাই জোয়ানো—যদুনাথকি জয়!

[সারিবন্দী জাঠ চলিল। রঘুজাঠের শেষ কথা—যদুনাথকি জয়! বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা লম্বা ধ্বনিতে 'হে'—শব্দ তুলিল। ওদিকে নেপথ্য হইতে 'হা'—শব্দ উঠিয়া বিস্ফোরণের ধ্বনিতে পরিণত হইল। রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। নাকাড়া বাজিয়া চলিয়াছে]

ষষ্ঠ দৃশ্য

গোকুলতীর্থ

গাঢ় অন্ধকার রাত্রি

[দৃশ্যারম্ভের সূচনায় প্রচণ্ড সংঘর্ষদ্যোতক শব্দ হইল। আবদালী স্বয়ং গোকুলতীর্থ আক্রমণ করিয়াছেন। গোস্বামী-সৈন্যদল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়াছে। আফগান সৈন্য প্রচণ্ডবেগে আসিয়া চার্জ্জ করিল। সেই শব্দে সমস্ত পরিপার্শ্ব কাঁপিয়া উঠিল। অন্ধকারের মধ্যে ওপারে মথুরা পুড়িতেছে। একা বালাজীরাও দাঁড়াইয়া আছেন বন্দুক হাতে। নাকাড়া বাজিতেছে। বন্দুকের শব্দ হইতেছে। দৃশ্য আরম্ভ হইল সংঘর্ষ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে। নেপথ্যে আর্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল হজরত বেগমের]

নেপথ্যে নসীবন—তামাম হিন্দুস্থান আঁধিয়ারায় ঢেকে যাচ্ছে। তারই মধ্যে মুঘল বাদশাহী কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে ভেসে যাচ্ছে। আমার নসীবও অন্ধকার। ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মরব—আমি মরব।

নেপথ্যে বুড়ী—কোনও ভয় নেই—তুই মন্দিরে গোকুলনাথের পাশে ব'স্। কোনও ভয় নেই—ভগবান—ভগবান রক্ষা করবেন।

নেপথ্যে নসীবন—না না। পাথর। পাথর কি রক্ষা করবে? ছেড়ে দাও আমাকে।

নেপথ্যে নরিন্দর—আরে বেটী, কি বলছ তুমি? পাথর ফেটে ভগবান বেরিয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না? লড়ছে কে? ব'স তুমি মা, কোনও ভয় নাই।

[প্রবেশ করলেন রণোন্মাদনায় মত্তের মত নরিন্দর গিরি]

নরিন্দর—রুদ্র না জাগলে অগ্নিমুখ আক্রমণকে বাধা দিলে কে? জ্বালামুখী! জ্বালামুখী! আ! পণ্ডিত, দাঁড়িয়ে আছ?

বালাজী—হ্যাঁ গিরি মহারাজ। জ্বালামুখী তীর্থ দেখছি। ওপারে সাত দিন আজ মথুরা পুড়ছে। দশ হাজার জাঠ প্রাণ দিয়ে বাধা দিতে পারে নি। আপনারা গোকুল মহাবনে আবদালীকে বাধা দিয়েছেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত আপনারা! কিন্তু কে যেন একটি মেয়ে পাগলের মত চীৎকার ক'রে উঠল?

নরিন্দর—কে জানে ভাই, রাজলছমীর মত এক কুমারী। সহ্য করতে পারছে না। জলমগ্নের মত হাঁপাচ্ছে, চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি।

[বাহিরে আবার শব্দ উঠিল—আ—
প্রত্যুত্তরে শব্দ উঠিল—এ—]

বালাজী—মহারাজ। আবার ছুটেছে আফগান সওয়ার।

নরিন্দর—হ্যাঁ হ্যাঁ। আসছে, আবার ঢেউ আসছে।

[তিনি ফুলিতে লাগিলেন। হাতের তরবারি নাচিতে লাগিল। বাহিরের 'এ' শব্দ শেষ হইতেই তিনি 'এ' শব্দ করিয়া ছুটিয়া গেলেন। দ্বিতীয় আফগান আক্রমণ সশব্দে আসিয়া প্রতিহত হইল। বিস্ফোরণদ্যোতক শব্দ হইল। বন্দুকের আওয়াজ হইতে লাগিল। পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল নসীবন]

নসীবন—না—না—না। এ আমি সহ্য করতে পারব না। কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না। মৃত্যু, আমাকে দয়া কর। তুমি আমাকে আশ্রয় দাও।

[কোষ হইতে ছুরি বাহির করিয়া তুলিল]

বালাজী—(চীৎকার করিয়া উঠিল) না না না।

[হজরত চকিত হইল, ফিরিয়া চাহিল। বালাজী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন]

আমি তোমার সন্তান। হাত ধরার অপরাধ মার্জনা কর। কিন্তু এ কি করছ তুমি?

নসীবন—মরব—আমি মরব। আমি মরব। ছেড়ে দাও, ম'রে আমাকে বাঁচতে দাও। আবদালী—ভয়ঙ্কর আবদালী আসছে।

বালাজী—আসুক। ভয় কি? কোনও ভয় নেই তোমার—আমার পিছনে এসে দাঁড়াও তুমি।

নসীবন—তুমি উন্মাদ।

বালাজী—না না। উন্মাদ তুমি। নইলে যে মৃত্যুর চেয়ে জীবের কাছে ভয়াল কিছু নেই তাকে তুমি ভয় কর না। মরতে তো ভয় নেই তোমার—আবদালীকে এত ভয় কেন?

নসীবন—(প্রথমে চমকিয়া উঠিল, তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বলের মত প্রশ্ন করিল, তুমি কে? তুমি কি দেবদূত?

বালাজী—আমি মারাঠা পেশবা বালাজী বাজীরাও।

নসীবন—মারাঠা পেশবা বালাজী বাজীরাও! (কাঁপিতে লাগিল)

বালাজী—আমি শপথ করছি মা, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে রক্ষা করব। কোনও ভয় নেই তোমার।

নসীবন—খোদা মেহেরবান! (বসিয়া পড়িল)

[নেপথ্যে সিঙ্গা বাজিয়া উঠিল]

নেপথ্যে নরিন্দর—জল! জল! এক লোটা জল! জলদি।

[সঙ্গে সঙ্গে একজন গিরির প্রবেশ]

গিরি—(ঘোষণার মত উচ্চকণ্ঠে বলিতে বলিতে ত্রস্ত প্রবেশ করিল, শাহ আবদালী তৃষ্ণার্ত। উকিল যুগলকিশোর এসেছে। যমুনার জল গলিত শবের বিষে প'চে উঠেছে। এক লোটা জল। আফগান ফিরে যাচ্ছে। এক লোটা জল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সূর্যোদয় হইতেছে। আকাশে মেঘ থাকায় সারা আকাশ লাল। তাহারই ছটায় চারিদিক রক্তাভ আলোয় উজ্জ্বল।

আবদালীর আক্রমণ-বিধ্বস্ত উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চল। সেই জাঠ গ্রাম 'চৌমুহা'। গ্রাম্য পথের ধারে রঘুনাথ জাঠের বাড়ি। সবটাই পুড়িয়া গিয়াছিল; তাহারই খানিকটা মেরামত করিয়া তাহারা বাস করিতেছে। এক দিকে একটা পোড়া ঘরের দাওয়া। পোড়া খুঁটি একটা দাঁড়াইয়া আছে। অন্য দিকে একখানা নতুন খাপরা-ছাওয়া ঘর। গন্না বেগম—ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দু গায়িকা ভিখারিণীর বেশে, এই আক্রমণের বেদনা ও ক্ষোভ লইয়া গান রচনা করিয়া পথে পথে গাহিয়া ফিরিতেছে। কবি পিতা-মাতার সন্তান, সে নিজেও কবি। সঙ্গে লইয়াছে একদল পিতৃমাতৃহীনা অনাথা মেয়ে। সে গাহিতেছে মূল গান—তাহারা গাহিতেছে ধুয়া। রঘুনাথের বাড়িতে কাহাকেও দেখা যায় না। পথ দিয়া দুই-চারিজন লোক যাইতেছে। তাহারা দাঁড়াইয়া একটু শুনিয়াই চলিয়া যাইতেছে।

গন্না প্রারম্ভেই শুরু করে:—"তামাম হিন্দুস্থানে নেমে এল আঁধিয়ারা।" অঙ্ক শুরু হইবার কিছু আগে হইতেই তাহার কথা শোনা গেল]

গন্না—(দৃশ্যোন্মোচনের পূর্বে) হায় রে হায়! হায় রে হায়! (দৃশ্য উন্মোচিত হইল) তামাম হিন্দুস্থান ঢেকে নেমে এল আঁধিয়ারা। সেই আঁধিয়ারায় মুঘল বাদশাহী কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে ভেসে চ'লে যাচ্ছে। আমাদের নসীবেও নামল আঁধিয়ারা! সেই আঁধিয়ারার সন্ধান পেয়ে দানার মত এল তারা; এক হাতে মশাল, এক হাতে তলোয়ার। হা রে হা! হা রে হা! পুড়ে গেল ঘর, পুড়ে গেল ক্ষেত, জ্ব'লে গেল বুক, কাটলে মানুষের গলা, দরিয়ায় দিলে ভাসিয়ে। হা রে হা!

সেই সঙ্গে আমার গান—তাও গেল পুড়ে—তাও গেল ভেসে—

মেয়েরা—(ধুয়া গাহিয়া উঠিল কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে) হায় দরদী !—হায়! হায়! হায়! আমার গান ফিরে দাও, আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন—! হায়—হায়—হায়! হায় দরদী হায়!

গন্না— (আমার) সুরের তার ছিঁড়েছে,
সকল ভাবের ঘর পুড়েছে—
গানের কথা ভাসিয়ে দিলে রক্তনদীর বান!

মেয়েরা— হায়—হায়—হায়! হায় দরদী!
আমার গান ফিরে দাও!
আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

গন্না— কয় যে দরদী, আছে আছে রে!
মাটির মাঝে—নদীর কাছে রে!
বুক পেতে দে মাটির বুকে নদীর ঘাটে কান!

মেয়েরা— হায়—হায়—হায়! হায় দরদী!
আমায় গান ফিরে দাও!
আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

গন্না— বুক যে মাটির ছাইয়ে ঢাকা গো!
আমার বুকের রক্ত মাখা গো!
ধুলোর মাঝে মিশিয়ে গেল আমার প্রাণের প্রাণ!

মেয়েরা— হায়—হায়—হায়! হায় দরদী!
আমার গান ফিরে দাও!
আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন!

গন্না— নদীর বুকে চলেছে ভাসি রে

আমার সকল কথা হাসি রে !
(আমার) সকল সুখ সকল আশা সকল অভিমান !

মেয়েরা— হায়—হায়—হায় ! হায় দরদী হায় !
আমার গান ফিরে দাও !
আমার হারিয়ে যাওয়া গা—ন !

[গন্নার সুর, স্বর, ভঙ্গি অকস্মাৎ পরিবর্তিত হইয়া গেল। সে নূতন সুরে এবার গান ধরিল]

গন্না— বলছে মাটি—না—ই ! বলছে—
তোর সে ব্যথা আমার বুকে আগুন হয়ে জ্বলছে !
জ্বলছে—! অগ্নিজ্বালায় !

[মেয়েরাও পরিবর্তিত সুরে ভঙ্গিতে গাহিয়া উঠিল নূতন ধুয়া]

মেয়েরা— (তবে) জ্বালা জ্বালা রোশনি জ্বালা,
বুকের জ্বালায় জ্বালিয়ে তুলে রোশনি জ্বালা !

গন্না ও সকলে— নসীবের রাতের পালায় মশাল জ্বালা—
লালচে আলোর উল্কা মালা !
আগুন জ্বালা !

[গানের ঠিক মধ্যস্থলে ছাওয়া-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল জবাহির সিং। শীর্ণ দেহ, কপালে একটি দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন ; সদ্য শুকাইয়াছে। মাথায় পাগড়ী নাই ; মাথার চুল উড়িতেছে ; চোখে অসুস্থ দৃষ্টি। মথুরার যুদ্ধে সে মাথায় আঘাত পাইয়াছিল। স্মৃতিবিভ্রম ঘটিয়াছে। অত্যন্ত দুর্বল। আজই এই প্রথম সে বিছানা হইতে উঠিয়াছে। মা-বাবা কেহ বাড়িতে নাই। গান শুনিয়া আসিয়া ঘরের পোড়া খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। একাগ্র অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে গন্নার দিকে চাহিয়াছিল। গানের শেষে সে আসিয়া গন্নার সামনে দাঁড়াইল। সে আসিয়া দাঁড়াইল বলিয়াই গানটি ওখানে শেষ হইল। নহিলে গান আরও আছে। তাহাকে দেখিয়াই গন্না গান থামাইয়া বসিল]

গন্না—ছোট সর্দারজী! (পিছনের দিকে জবাহির ছিল বলিয়া গন্না তাহাকে দেখে নাই)

জবাহির—মশাল জ্বালিয়ে আগুন লাগাতে এসেছিল, তারা—তারা কে? অ্যাঁ? আর—আর—তুমি কে?

গন্না—(জবাহিরের অবস্থা সে জানে তাই ও-প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল) তুমি নিজে উঠে এলে সর্দার? উঠতে পেরেছ তুমি? ভাল মনে হচ্ছে? (সস্নেহে সহর্ষে সে দীপ্ত হইয়া উঠিল)

জবাহির—হাঁ হাঁ। আমি তো ভালই আছি। কিন্তু তারা কারা? কোথায় গেল তারা? কোন্ দিকে?—আ! আকাশ লাল হয়ে রয়েছে! আবার কোথায় আগুন লাগালে তারা? আঃ—আমার তলোয়ার আর বন্দুক? মা—মা—মা!

গন্না—না, সর্দারজী না। আগুন নয়, আগুন নয়।

জবাহির—নয়?

গন্না—না। দেখছ না সূর্য নারায়ণ উঠছেন! সূর্য নারায়ণ!

জবাহির—হাঁ—হাঁ। (ঘাড় নাড়িল)। হে সূর্য নারায়ণ, হে দেওতা, প্রণাম! তা হ'লে তারা চ'লে গেছে?

গন্না—হাঁ। তারা চ'লে গেছে। বহেনো, তোরা চল্, সর্দারের মাতাজী আসুক, আমি যাচ্ছি।

[সকলে চলিয়া গেল]

জবাহির—কিন্তু—কিন্তু—

গন্না—আবার কি? তুমি ঘরে চল! তুমি কাঁপছ—তুমি—

জবাহির—হাঁ হাঁ হাঁ। তুমি, তুমি, তুমি কে? কে বল তো তুমি?

গন্না—আমি ভিখ্ সা মেগে বেড়াই সর্দার, গীত শুনাই, ভিখ্ সুকের কন্যা।

জবাহির—(ঘাড় নাড়িল প্রত্যেক বার) উঁহু! উঁহু! উঁহু! আমি যে তোমাকে দেখেছি। হাঁ। দেখেছি।

গন্না—না—না—না। এ দেশে আমি এসেছি নতুন। সেই আফগানেরা যখন এসেছিল তখন তোমার মা আমাকে বাঁচিয়েছিল, তুলে এনেছিল জঙ্গলের ভিতর থেকে। তখন তুমি মাথায় চোট লেগে বেহোঁশ। কি ক'রে দেখবে আমাকে?

জবাহির—তবে সে কে?

গন্না—কে?

জবাহির—সেই। হাঁ হাঁ। সে তো তুমি। তোমার সঙ্গে এক বুড্ঢা আমীর; না না—(ভাবিয়া) ফকির, হাঁ, ফকির। আর তুমি—? দাঁড়াও, মনে করি। পানসীর অন্দরে—বেহোঁশ হয়ে কাতরাচ্ছিলে—আমি তুললাম। বললাম, তুমি রাধারাণী। তুমি বললে—না না, এখানে থাকব না আমি। সে তুমি নও?

গন্না—না সর্দার। তোমার ভুল হচ্ছে। তুমি যার কথা বলছ তাকে আমি জানি। আমি শুনেছি, তুমি তার পানসী পাঠানের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, সে আমি নই। সে হ'ল শুনছি মুঘল বাদশাহ বংশের রাজলছমী। লোকে বলছে, সে নাকি যমুনায় ঝাঁপ দিয়েছে!

জবাহির—মুঘল বাদশাহের ঘরের রাজলছমী?

গন্না—হাঁ সর্দার।

[জবাহির মাথায় হাত দিয়া বসিল]

গন্না—ওঠ সর্দার। চল, ঘরে তোমাকে শুইয়ে দিয়ে যাই।

জবাহির—(হঠাৎ মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল) যমুনায় ঝাঁপ খেয়েছে?

গন্না—না খেয়ে কি করবে বল ? আঃ, চীৎকার ক'রে ব'লে গেছে—"তামাম হিন্দোস্থানে আঁধিয়ারা নেমে আসছে। আঁধিয়ারার অন্দরে—মুঘল বাদশাহী কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে কোথায় ভেসে চ'লে যাচ্ছে ! আমার নসীবও অন্ধকার। আমায় ছেড়ে দাও—আমায় ছেড়ে দাও !"

জবাহির—(অভিভূত ভাবে বলিয়া উঠিল) হা-হা-হা ! হা-রে !

গন্না—ওঠ, সর্দার ওঠ ।

[জবাহিরের হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। জবাহির উঠিতে গিয়া তাহার হাতের কঙ্কণ দেখিয়া মুখের দিকে চাহিল]

জবাহির—(তাহার হাতের কঙ্কণ দেখিয়া) তা হ'লে এ কাঁকনি ? এ কাঁকনি যে তার হাতে ছিল ! আমি দেখেছি যে তার হাতে ছিল ! আমি দেখেছি যে !

গন্না—সে সোনার, এ পিতলের,—তাতে ছিল সাচ্চা জহরত, এ হ'ল ঝুটা কাচ সর্দার ।

জবাহির—উঁহু, স্পষ্ট মনে পড়েছে—সন্ন্যাসিনীর মত পোষাক—হাতে কঙ্কণ। নও—সে তুমি নও ?

গন্না—না, না। অই অই তোমার মাতাজী আসছে, অই !

জবাহিরের মা রতনবাঈ—(নেপথ্যে) হে ভগোয়ান ! হে সুরুয নারায়ণ, তুমি এর বিচার ক'রো। তোমার চোখে তো কিছু ছিপা থাকে না ! সব তো দেখছ তুমি ! আমার রোগা বেটাকে এক মুঠ্যি মুংদালের সুরুয়া ক'রে দেব, তা মিলল না। আমার মরদ, দেব্‌তা, আমার বেটা—তিন তিন পহর বেলা লড়াই দিয়ে পুরা দিন আফগানকে রুখেছিল—তাই না বানিয়ারা শেঠরা পালাতে সময় পেয়েছিল মথরা থেকে ? নইলে ?—হা রে হা ! হা রে হা ! তারাই আজ এক মুঠ্যি

মুংদালের দাম চাইছে এক সিক্কা! আমার মরদ ম'রে গেল—আমার জবাহির—

[প্রবেশ করিয়াই গয়াকে দেখিয়া ব ;

আ! আ মেরি বেটী! আরে তুই কতক্ষণ? আ—মেরে জবাহির—মেরে বেটা! বেটা আমার উঠে এসে দাঁড়িয়েছিস কি আনন্দ রে—আমার কি আনন্দ! হে দীনদয়াল, হে আমার মথুরানাথ! আমার গোকুলনাথ! আমার জবাহি যে উঠে দাঁড়াবে তা আমি ভাবি নি। (পরমানন্দে) মেরে জবাহির, মেরে গোপাল, মেরে দুলাল! কিন্তু তোকে আজ আমি খেতে কি দোব বল্ তো? এক মুঠ্যি মুংদাল—তার দাম এক রুপেয়া? পাঠান চ'লে গেছে, বানিয়ারা আজ ফিরে এসে দেশের সব চিজ কিনে চেপে বসেছে, গর্দানায় ছুরি দিচ্ছে, জিরা বেচেছে হীরার দামে!

গয়া—হে ভগবান, এয় খোদা! তুমি কি নাই?

জবাহির—কি? এ কার কথা? তোমার? তবে? তবে? মা—মা; এ নয় সে? সে?

রতনবাঈ—সে? না বেটা, এ সে নয়। এও তারই মত একজন। পথের ধূলো থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। কোন রাজার ন কোন বাদশাহার বেটী, কি যে মনের দুখ ওই জানে। বললাম—তবে বল্ বেটী, কোন্ রাজপুরীতে কি কোন্ মতিমহলে যাবি—সেখানে রেখে আসি। তা বললে—না। বললাম—তোর বাপ যদি জান দিয়ে থাকে আফগানের হাতে, পুড়ে গিয়ে থাকে দৌলতখানা, তাতেই বা কি? আমার বেটী নাই, আমার বেটীর মত থাক্—জীবন আমার ভ'রে উঠুক; তাও—না। বাপ-মা-মরা মেয়ের দল নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ভিখ্ মা মেগে বেড়াচ্ছে। বলছে—দেশে আগুন জ্বলবে।

জবাহির—হাঁ হাঁ। জ্বলবে! জ্বলবে! আমি বেয়ব মশাল নিয়ে। যেখানে তাদের পাব, আগুন জ্বালিয়ে বিলকুল পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেব। ভস্‌ম—ভস্‌ম—ভস্‌মে ঢেকে দেব মাটি।

গন্না—(হাতে তালি দিয়া বলিয়া উঠিল) আরে মেরে সর্দারজী! আ হো মেরে রুস্তম! হাঁ—(গাহিয়া উঠিল)

জ্বালা জ্বালা রোশনি জ্বালা

বুকের জ্বালা জ্বালিয়ে তুলে রোশনি জ্বালা!

নসীবের রাতের পালায় পোড়া বুকের উল্কামালায়

জ্বাল্ দেওয়ালী। আগুন জ্বালা—

জবাহির—হো—হো—হো! হো—হো—হো! হো—হো—হো!

[বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল]

রতন—বেটা! জবাহির! মেরে গোপাল!

গন্না—সর্দারজী! সর্দার!

জবাহির—জল! (ম্লান হাসিয়া ঘাড় নাড়িল) তিয়াস।

রতন—ঘরে চল্ বেটা! ঘরে—ঘরে। শুয়ে পড়বি, জল খাবি, আমি হাওয়া করব। বেটা! ধর্—ধর্ বেটী।

গন্না—ওঠ, ওঠ সর্দার!

[দুইজনে জবাহিরকে ধরিয়া লইয়া গেল]

[নরিন্দর গিরি প্রবেশ করিলেন]

নরিন্দর—বেটী রতনবাঈ!

[রতনবাঈ বাহির হইয়া আসিল]

রতন—(ছুটিয়া আসিল পরমানন্দে, পা দুটি ধরিয়া বলিল)—জয় গুরু মহারাজ—হে মেরে ভগবান! তোমার কিরপায় আমার জবাহির উঠে দাঁড়িয়েছে।

নরিন্দর—উঠে দাঁড়িয়েছে ?

রতন—হা বাবা ! বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। বেটী রট্টার গীতের সঙ্গে হো-হো-হো ক'রে আনন্দ করলে ! বললে কি জান বাবা ? বললে—মশাল নিয়ে আমি যাব—তাদের মুলুক ছাই ক'রে দিয়ে আসব।

নরিন্দর—আচ্ছা ! আচ্ছা ! বীর জবাহির সিং তা পারবে। কোথায় সে ?

রতন—বহুৎ কষ্টে তাকে ঘুম পড়িয়েছি বাবা। রট্টাকে বসিয়ে তোমার ডাক শুনে ছুটে এলাম। তোমার ওষুধ—বাবা—তোমার ওষুধ—নইলে জবাহির আমার—(ঘাড় নাড়িল) সর্দার চ'লে গেল। জবাহিরের জন্যে আমি যেতে পারলাম না। আমার নসীব !

নরিন্দর—কিছু ভয় নেই মাতাজী। জবাহির শিগগির সেরে উঠবে এইবার। এই নাও, শুনলাম তুমি মুংদাল খুঁজতে গিয়ে পাও নি। নাও, সুরুয়া ক'রে দাও জবাহিরকে।

[ছোট একটি থলি দিলেন]

রতন—দীনদয়াল মেরে বাবা, তুমি আমার দীনদয়াল। মুলুক শ্মশান ক'রে দিয়ে গেছে আবদালী পাঠান—চানা নাই, দানা নাই, সত্তু নাই, মাসদাল যা মানুষ খেত না—গরুতে খেত—তাও রুপেয়াতে পাঁচ সের। জাঠেরা ফকির হয়ে গিয়েছে লুঠে নিয়ে গিয়েছে, ঘর পুড়ে তামা পিতলের বর্তন গ'লে তাল ব'নে গেছে। দীনদয়াল তুমি—তোমার আশ্রয় থেকে এক মুঠ্যি ক'রে চানা দানা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছ। যার জখম হয়েছে তাদের বাঁচিয়ে তুলেছ।

নরিন্দর—মথুরানাথের আদেশ মাতাজী ! যারা তাঁকে রক্সা করবার জন্য এমনভাবে প্রাণ দিলে, তারা কি না-খেয়ে মরতে পারে? তিনি আদেশ দিলেন আমাকে—গিরি, ওদের খেতে দেবার ভার তোর উপর দিলাম আমি। সবই তিনি করছেন—আমি না, আমি সে আদেশ পালন করছি শুধু। প্রণাম জানাও তাঁকে।

রতন—বাবা! একটি আরজ আমার তা হ'লে মথরানাথকে জানিয়ো গুরু মহারাজ। (হাতজোড় করিয়া বলিল)

নরিন্দর—বল বল। তোমরা যা বলবে তিনি তাই শুনবেন।

রতন—সরম লাগছে বাবা! কোন্ মুখে বলব! পর্ভুকে রক্সা করতে গিয়ে তো পারি নি রক্সা করতে, তা হ'লে বড় মুখ ক'রে বলতাম, যদুনাথ! গরীব মুরুখ্ চাষী, পেটের জ্বালায় বুকের দুখে, ওরা লুঠেরা হয়েছিল—গরীব যাত্রীদের লুঠ করেছে, তাতে পাপ হয়েছে; কিন্তু দেওতা, ওরা তোমার রাজধানী রেখেছে, তোমার নিদ্ ভাঙতে দেয় নি, সেই পুণ্যে ওদের গতি কর। কসুরের সাজা মাফ দিতে তুমি হুকুম দাও। কিন্তু তা তো পারে নাই! তুমি তাঁকে ব'লো মহারাজ—আমার বুঢ়োয়ার যেন গতি হয়। জাঠ চাষীদের দণ্ড দণ্ডদাতা যেন মাফি দেন।

নরিন্দর—জাঠদের অক্ষয় স্বর্গবাস হয়েছে মাতাজী, জাঠ সর্দার রঘুনাথ পরমগতি লাভ করেছে। তাদের সকল পাপ তারা নিজে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে বুকের রক্ত ঢেলে। আমি বলছি তোমাকে।

রতন—আ—আ। জয় মথরানাথ, জয় গোকুলনাথ! এ না হ'লে যুগে যুগে মানুষ তোমার জন্তে কাঁদে কেন? কিন্তু তুমি একবার জাগলে না কেন? তা হ'লে কি জাঠ হটে, না, জাঠ মরে! তোমাকে একবার চোখে দেখলে এক জাঠ দশ দশ জাঠের জোরে জোরদার হয়ে উঠত। কোথায় ভেসে যেত তিশ

হাজার আফগান! হা! হা-হা-হা-হা! দশ হাজার জাঠের ছ হাজার খতম হয়ে গেল। চার হাজার রইল—তাও জখম হয়ে বাঁচল। ক্ষেত কাঁদছে গুরু, চাষী নেই ; জেনানীরা কাঁদছে, স্বামী নাই—বেটা নাই—বাপ নাই। হা-রে—হা!

নরিন্দর—আমি বলছি মাতাজী, জাঠদেশ আবার নওজোয়ানে ভ'রে উঠবে। ভগবান মঙ্গল করবেন। যখন প্রলয় হয় মা, তখন এমনি হয়। তখন যারা কষ্টের মধ্যে জ্ব'লে ওঠে তারাই পৃথিবীতে বড় হয়।

রতন—তা হ'লে বাবা, ওই যে রাজলছমী ব'লে গেল—সে কথা সত্যি? গোটা দেশে তো ওই ছাড়া কথা নাই। হিন্দুস্থানে আঁধার নামছে, মুঘল বাদশাহী যাচ্ছে? পাথর ফেটে দেবতা বেরুবেন?

নরিন্দর—হ্যাঁ মা। খুব দুঃসময়, তাতে ভুল নেই। এ সময়ে দেবতা তো জাগেন—জাগারই তো কথা। মথুরা লুঠের সময় তিনি তো পার্শ্বপরিবর্তন করেছেন জাঠেদের মধ্যে—আমি তো দেখেছি। সেই জন্যেই তো পেশবা জবাহিরকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। জবাহিরকে সম্মান ক'রে তিনি সেই দেবতাকেই পূজা দেবেন।

রতন—বাবা, তুমি বলছ বটে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, পেশবা যে জবাহিরকে নেওতা পাঠিয়েছেন সে আমার বেটা চাষা জবাহির নয়, ও বাবা, রাজা সুরজমলের বেটা কুমার জবাহির হবে। পেশবা!—সে হ'ল মারহাটার শাহানশা, ব্রাহ্মণ, বড়া ভারি পণ্ডিত, সে কেন ডাকবে গরীব চাষীর বেটাকে?

নরিন্দর—না মাতা, না। আমাকে তিনি লিখেছেন, চৌমুহা গ্রামের বীর জাঠ সর্দার জবাহির সিংকে নিয়ে আসবেন, তাকে আমি সম্মান করব।

রতন—আমার যে ডর লাগছে বাবা! চাষীর ছেলে, রোগা দেহ, মগজের গোলমাল—কি হবে—কি করবে? রাজার দরবার! ওরা বাবা লড়াই করে, লুঠ করে—তখন ঠিক থাকে; রাজা মহারাজা, যে হোক তার সামনে দাঁড়ায় মরণের সিপাহীর মত; কিন্তু দরবারে কি আসরে একদম বোকা—বোকা চাষা—

নরিন্দর—আমি সঙ্গে থাকব মা। কোনও ভয় নাই। আর ততদিনে জবাহির সেরেও উঠবে। মা, তোমাকে বলি—মারহাঠা পেশবা এবার ধরমপাদ পাদশাহী স্থাপন করবে।

রতন—হাঁ হাঁ হাঁ। হিন্দুপাদ পাদশাহী! শুনেছি বাবা। আর ডর-কে মারে থরথর ক'রে কেঁপেছি। আরে বাবা, কি জুলুম বাবা মারহাঠার! সমান লুঠ বাবা—সমান লুঠ! ফরক শুধু এরা জেনানী আদমী লুঠে বেঁধে নিয়ে যায় না, হাটে বেচে দেয় না। কিন্তু নাক কান কেটে দেয়। হে মথরানাথ!

নরিন্দর—না মাতাজী। মারহাঠা এবার বদলাবে। আমাকে বলেছে পেশবা।

[গন্না বাহির হইয়া আসিল]

গন্না—মাতাজী! তুমি এবার ঘরে যাও মাতাজী, বহু কষ্টে সর্দারকে ঘুম পাড়িয়েছি।

নরিন্দর—যাও মা যাও। আবার আসব, আবার দেখা হবে। যাও। জবাহির উঠে পড়বে। ওর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

[রতনবাঈ প্রণাম করিয়া ডালের থলিটা লইয়া চলিয়া গেল]

গন্না—প্রণাম গিরি মহারাজ।

নরিন্দর—রট্টা দেবী, তুমি বেটী আশ্চর্য! গন্নাকে একেবারে মুছে দিয়ে রট্টা হয়ে উঠেছ। বসরার গুলাব—জবাফুল হয়ে গেল।

গন্না—তয়ফাওয়ালী হ'লেও আমার মা যে হিন্দুর মেয়ে ছিলেন মহারাজ।

আমার বাবা ছিলেন উদার কবি মুসলমান। তা ছাড়া প্রভু, আমি যে নিজে তয়ফাওয়ালী।

নরিন্দর—তুমি মা কল্যাণী, সব তোমার ধুয়ে মুছে গেছে। তুমি পবিত্র। তুমি রত্না দেবী।

[গন্না পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। বাহিরে তাহার গান শোনা গেল]

আমার গান ফিরে দাও—
আমার হারিয়ে যাওয়া গান।

সমবেত স্বর—

হায়—হায়—হায়, হায় দরদী হায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

পেশবার প্রাসাদ

[রাত্রিকাল। বাহিরের নগরপথের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে—দেওয়ালী—দেওয়ালী—দেওয়ালী। আবছা অন্ধকার কক্ষে একজন পরিচারক জানালা ও ঝরোকা খুলিল। বাহির হইতে দেওয়ালীর আলোকচ্ছটা আসিয়া প্রবেশ করিল। কক্ষে একটি আলো জ্বলিল। বাহিরে আলোকিত নগরীর একাংশ দেখা যাইতেছে। পরিচারক চলিয়া গেল।

প্রবেশ করিল—পেশবার তরুণ পুত্র বিশ্বাসরাও ও নসীবন বেগম। বিশ্বাসরাও নসীবনেরই সমবয়সী—বয়স সতের-আঠারো বৎসর। রূপবান কিশোর-যুবা। ইতিহাস বলে—এমন রূপ সুদুর্লভ। ["Though he was an Indian yet no man of such light complexion and beautiful shape came in their [Afgan] sight. His colour was that of real champa flower etc.—Sir Jadunath]

সমগ্র মহারাষ্ট্রের সে নয়নানন্দ। তাহার পিছনে নসীবন বেগম। তাহার অঙ্গে ফকিরিণীর পরিচ্ছদ, সে ঈষৎ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিষণ্ণ দৃষ্টি; রুক্ষ চুল—দুই পাশে অর্ধ-বেণী বদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে]

বিশ্বাস—মহারাষ্ট্র পেশবা আসছেন। আপনি ততক্ষণ বরং আলো

দেখুন। আজ দেওয়ালী। আমাদের অতি পুণ্য পর্ব আনন্দের পর্ব। দীপাবলী—আলোকোৎসব—দীপালী। সাধারণে বলে, দেওয়ালী। জানেন তো তিথিতে আজ অমাবস্যা—

নসীবন—জানি। আমাদের রমজান চলছে কুমার সাহেব। কাল চাঁদ দেখতে পাব কিনা জনি না, তবে আজই আঁধিয়ারার শেষ।

বিশ্বাস—হ্যাঁ হ্যাঁ শাহজাদি জানি। আপনি উপবাস করছেন। বড় পবিত্র আপনাদের রমজান। আত্মার গ্লানি দূর করার ব্রত। উপবাসশীর্ণ মুখে ফকিরিণীর পরিচ্ছদে আপনাকে মূর্তিমতী পবিত্রতার মত দেখাচ্ছে।

নসীবন—জানি না কুমার সাহাব। আমার অন্তর বেদনায় ভ'রে উঠেছে—আর এক ফোঁটা ধরবার স্থান নেই। তাই আলো দেখতে ছুটে এলাম।

বিশ্বাস—আমাদের পর্বের অর্থও তাই। আলোয় আলোয় অমাবস্যার অন্ধকারকে দূর করা যায়।

নসীবন—কিন্তু মনের অন্ধকার কুমার সাহেব? তাও দূর হয়? (ভাবিয়া) হয়তো হয়। গরীব দুঃখীদের ঘরে আলোর সারি জ্বালে—সে কি আনন্দ তাদের! আলোর ছটায় লুকানো রূপ যেন ফুটে বের হয়; দিনের আলোতেও সে দেখা যায় না। আমার এক বাঁদী, সে ছিল কালো মেয়ে, সে সন্ধ্যায় বাতি দিতে আসত—মনে হ'ত, কালো মেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠেছে।

বিশ্বাস—দেখুন, দেখুন, দরবারের আলো বোধ হয় জ্বালা হ'ল। আলোর ছটা বেড়ে উঠল।

নসীবন—(ফিরিয়া দেখিল, তারপর পর্দা ফেলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল) এবার বোধ হয় দিল্লীতে দেওয়ালী হবে না। শুধু

দিল্লী কেন—আগ্রা থেকে আটক পর্যন্ত আফগান যে পথে এসেছে যে পথে গিয়েছে—কোথাও হবে না।

বিশ্বাস—আগামী দীপাবলীতে জ্বলবে শাহজাদী। গোটা ভারতবর্ষকে এমন আলোর মালায় সাজাব যে, তার ছটা হিন্দুকুশের ওপর থেকে আফগান দেখবে। চোখ ঝলসে যাবে।

নসীবন—কুমারজী সমগ্র মহারাষ্ট্রের আপনি আঁখো-কি রোশনি; শুধু মহারাষ্ট্রের কেন, সব মানুষের মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে আপনাকে দেখলে। আপনি জ্বাললে—জ্বলবে সে আলো।

বিশ্বাস—আমিই সে ভার পেয়েছি শাহজাদী; মহারাষ্ট্রের ঐ অভিযানে আমিই হব প্রধান সেনাপতি। আগামী যুদ্ধে আবদালীর সামনে দাঁড়াব আমি।

নসীবন—আবদালীর সামনে দাঁড়াবেন আপনি?

বিশ্বাস—হাঁ আমি। আজই আমাদের—

[ঘরের আলোটা নিবিয়া গেল। নসীবনই পিছন ফিরিয়া ফুঁ দিয়া আলোটা নিবাইয়া দিল। বিশ্বাস দেখিল না।]

বিশ্বাস—[চকিত হইয়া] এ কি? আলোটা নিবে গেল? আলো! আলো!

নসীবন—থাক্ কুমারজী। আমিই নিবিয়ে দিয়েছি আলো। আলো ভাল লাগছে না আমার।

বিশ্বাস—কিন্তু দীপালীতে যে ঘর অন্ধকার রাখতে নাই। (সে বন্ধ করা পর্দা খুলিয়া দিল)

নেপথ্যে বালাজী—শাহজাদী!

বিশ্বাস—মহামান্ত পেশবা আসছেন। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করুন, শাহজাদী! আমি আলো নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

[শাহজাদী নসীবন কয়েক পা আগাইয়া গিয়াও থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ডাকিয়া কিছু বলিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিলেন, সে হাত নামাইয়া লইলেন। পেশবা বালাজী রাও প্রবেশ করিলেন দরবারী পরিচ্ছদে]

বালাজী—মহামান্য শাহজাদী নসীবনউন্নীসা!

নসীবন—মহামান্য পেশবা! (অভিবাদন করিলেন)

বালাজী—শাহাজাদী, আমি ব্রাহ্মণ। ভগবানের আশীর্বাদ দিয়ে অভিবাদন আমাদের প্রথা। আমার সেই অভিবাদন গ্রহণ কর তুমি। ভগবান তোমার কল্যাণ করুন।

নসীবন—মহামান্য পেশবা, আপনি আমার পিতৃতুল্য। যে মুহূর্তে হতাশার তাড়নায় মৃত্যু ছাড়া আত্মীয় ছিল না, সেই মুহূর্তে আপনি পিতার স্নেহে আশ্বাস দিয়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আপনার আশীর্বাদ আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মধ্যে মধ্যে আমার ইচ্ছা হয়, হিন্দুকন্যার মত আপনার পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করি।

বালাজী—তোমাকে আমি কন্যাজ্ঞানেই গ্রহণ করছি মা। (মাথায় হাত রাখিয়া হাত নামাইয়া লইলেন) আজ কিন্তু তোমাকে অভিবাদন জানিয়ে সসম্ভ্রমেই কথা বলতে হবে আমাকে। উত্তর-ভারতে আমাদের অভিযান শুরু হবে। এই দেওয়ালীর রাত্রি আমাদের পবিত্র রাত্রি; শক্তি এবং লক্ষ্মী দুই উপাসনা একসঙ্গে একাধারে। মহারাষ্ট্রের শক্তি আছে, মুঘল রাজলক্ষ্মী-রূপা তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকেই দিল্লীর মসনদে অভিসিক্ত করিব স্থির করেছি।

[নসীবন চুপ করিয়া রহিলেন। মাটির পুতুলের মত স্থির তিনি]

আজই দরবারে তুমি উপস্থিত হও এই আমার অভিপ্রায়।

নসীবন—না। আমাকে আপনি মার্জনা করুন মহামান্য পেশবা।

বালাজী—কেন শাহজাদী ?

নসীবন—আমাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে কি লাভ আপনার পেশবা ? যে বিপুল শক্তির অধিকারী আপনি, তাতে এর প্রয়োজনই বা কিসের ?

বালাজী—প্রয়োজন আছে মা। আমি অনেক চিন্তা করেছি।

নসীবন—আপনি কি আমার ভাগ্যফলের কথা বলছেন ?

বালাজী—না মা। জ্যোতিষশাস্ত্রের আশ্বাসে আমার আস্থা নেই। সংসারে যারা দুর্বল, পারিপার্শ্বিক অবস্থাবৈগুণ্যকে অতিক্রম করতে পারে না—তাদেরই ভরসা ওটা। জ্ঞান এবং কর্মযোগ আমার বেদ। আমার বুদ্ধির বিচারে আমি বুঝেছি তোমাকে আমাদের উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আমাদের সাফল্য প্রায় সুনিশ্চিত।

নসীবন—জনাব, এ আমার পক্ষে হবে কঠোর নির্যাতন। দিল্লীর মসনদে ব'সে আমার জীবন শুকিয়ে যাবে। আপনি পিতা, আমি কন্যা। না—না—

বালাজী—অধীর হ'য়ো না মা। তুমি কি বলছ, ঠিক তার অর্থ—

নসীবন—(ওই প্রসঙ্গটি চাপা দিবার জন্যই বালাজীর কথার মধ্যস্থলে বলিয়া উঠিলেন—অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে) তা ছাড়া মহামান্য পেশবা, আপনি পিতার স্নেহে আমাকে ধন্য করেছেন, রক্ষা করেছেন, আমি কন্যার মত শ্রদ্ধাভরে আপনার মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে আছি। সে আশ্বাসের মর্যাদা যদি কোন মতে ক্ষুণ্ণ হয় তবে আমি বাঁচব কি নিয়ে ?

বালাজী—অবিশ্বাস ? আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না মা ?

নসীবন—মহামান্য পেশবা, আমি বালিকা ; রাজনীতিতে প্রশ্নের সীমা

নাই। হিন্দোস্থানে মুসলমানের ভাগ্য, বাবরশাহী বংশের অধিকার নিয়ে অনেক যে প্রশ্ন।

বালাজী—বাবরশাহী বংশধরদের রক্তে যত বিস্ময়কর আভিজাত্য তত বিচিত্র জটিলতা, তত ভোগ-মাদকতা; সে মাদকের প্রভাব উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জীবন পর্যন্ত অপবিত্র ক'রে তুলেছে। এই বংশে তুমি যেন ব্যতিক্রম। তোমার মত পবিত্র আত্মাকে যদি মসনদে বসাতে পারতাম, তা হ'লে—

নসীবন—বাবরশাহী বংশকে তখ্‌ৎ থেকে বঞ্চিত করতে হ'ত না?

বালাজী—না মা, বিশ্বাস ক'রে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। দৃষ্টির সতর্কতার খানিকটা সিংহাসনের দিকে নিবদ্ধ রেখে অপব্যয় করতে হ'ত না। বাবরশাহী বংশকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করার কথা এখনও ভাবি নি।

নসীবন—হিন্দুপাদ পাদশাহীর কথা আপনার গৃহে এসে আমি না-শোনা নই পেশবা।

বালাজী—এক সাধুর পরামর্শে সে কল্পনা আমি ত্যাগ করেছি বেটী। আমি এই দেশের মানুষের জন্তে ন্যায় এবং শান্তির বাদশাহী স্থাপন করতে চাই।

নসীবন—আপনি আমার পবিত্রাত্মার কি সন্ধান পেয়েছেন জানি না মহামান পেশবা, কিন্তু আমি আমার রক্তে জটিলতার কুটিল সঞ্চালন অনুভব করছি। ভাবছি, শাহজাদী তখ্‌তে বসবে; সুলতানা থাকবেন কুমারী। সন্তানহীনা সম্রাজ্ঞীর অন্তে—এ তখ্‌তের অধিকার আবার যাবে কার কাছে? বাবরশাহী বংশে যদি আর পবিত্রাত্মার সন্ধান না মেলে?

বালাজী—থাক্‌ মা, থাক্‌। বংশধারা বিচিত্র! বাবরশাহী বংশের রক্তের জটিলতা মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করলে তোমার মধ্যে।

নসীবন—মহামান্য পেশবা! আমি আর একবার ভেবে দেখি।

বালাজী—ভেবে দেখবে ?

নসীবন—পেশবা, খোদাতয়ালার তপস্যার বঞ্চনার মধ্যেও পরমানন্দ আছে। আর রিক্ত জীবন নিয়ে কণ্টকাকীর্ণ মসনদে ব'সে বাদশাহীর তপস্যা ? আমার রক্তে—(থামিয়া গেলেন) আমায় ভাবতে দিন।

বালাজী—তাই হবে। তুমি ভেবে দেখ।

[বালাজী চলিয়া যাইতে অগ্রসর হইলেন। নসীবন নিজের হাত মেলিয়া ধরিল চোখের সম্মুখে]

বালাজী—(ফিরিয়া আসিলেন) হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে আমার মা।

[নসীবন হাত নামাইল]

নসীবন—বলুন পিতা।

বালাজী—চৌমুহার যে জাঠ যুবককে তুমি পুরস্কৃত করতে চাও, সে এসেছে। দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে তোমার নিজে পুরস্কৃত করাই কি উচিত নয় ?

নসীবন—তাই হবে। (নিজের গলার হার খুলিয়া) এই হারই তাকে পুরস্কার দিতাম আমি। কিন্তু সে চাষী, এর মূল্য তার কাছে কি বলুন ? তার চেয়ে এই হারের মূল্য তাকে দিতে চাই আমি। অর্থ তার উপকারে লাগবে। মণিকারের কাছে বিক্রি ক'রে এর মূল্য আমাকে দেবেন পিতা।

বালাজী—তোমাদের রক্তে বিস্ময়কর আভিজাত্য। দাও। ঋণ তোমার থাকল না। বিশ্বাসরাও তোমাকে দরবারে নিয়ে যাবে শাহজাদী।

[হার লইয়া চলিয়া গেলেন]

[নসীবন আবার জানালার মধ্য দিয়া যে আলো আসিতেছিল সেইখানে হাত মেলিয়া ধরিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে বিশ্বাসরাও প্রবেশ করিল, হাতে তার বাতিদান। সে সেনাপতির পোশাকে সজ্জিত—কোষে তরবারি, মাথায় পাগড়ী]

বিশ্বাস—শাহজাদী! (সে দাঁড়াইল) কি শাহজাদী? কি হ'ল?

নসীবন—(প্রথমটা মুখ না তুলিয়াই বলিল) আমার হাতের শিরার মধ্যে বাবরশাহী রক্তস্রোতকে দেখতে চেষ্টা করছিলাম কুমার সাহব। পেশবা ব'লে গেলেন—(মুখ তুলিয়া বিশ্বাসের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া থামিয়া গেলেন)

বিশ্বাস—কি ব'লে গেলেন পেশবা?

নসীবন—(নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়াই ধীরে ধীরে বলিয়া গেলেন, কণ্ঠস্বর—মুগ্ধচিত্ততার গাঢ়তায় ক্রমশ গাঢ় হইতে লাগিল) ব'লে গেলেন—বাবরশাহী বংশের রক্তে যত বিস্ময়কর আভিজাত্য, তত বিচিত্র—(থামিলেন)

বিশ্বাস—কি তত বিচিত্র?

নসীবন—তত বিচিত্র কুটিল জটিলতা, তত—(থামিলেন)

বিশ্বাস—কি শাহজাদী?

[নসীবন অগ্রসর হইলেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত]

নসীবন—(মৃদু গাঢ় স্বরে) কি অপরূপ রূপ নিয়ে তুমি জন্মেছ কুমার! চম্পা ফুলের মত বর্ণ, পদ্মের পাপড়ির মত চোখ, বাতির আলো তোমার মুখে পড়েছে, কুমার, এর আগে আলোর আভায় এমন উদ্ভাসিত রূপ তো তোমার দেখি নি! মাথায় তোমার শিরবন্ধ, কোমরে তোমার তলোয়ার, কুমার—

বিশ্বাস—শাহজাদী! (তাহারও কণ্ঠস্বরে নসীবনের কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা প্রতিধ্বনিত হইল যেন)

নসীবন—আমার নীলশিরার অভ্যন্তরে বাবরশাহী বংশের রক্তে—
যুগ-যুগসঞ্চিত তৃষ্ণার মত্ততা।

বিশ্বাস—শাহজাদী!

[নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ধীর ছন্দে ঢং—ঢং—ঢং]

নসীবন—(থমকিয়া দাঁড়াইল) আমি বড় তৃষ্ণার্ত! রোজার উপবাস
ক'রে আমি ক্লান্ত—তৃষ্ণার্ত; বড় তৃষ্ণার্ত আমি।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন]

[ঘণ্টা বাজিতে লাগিল ঢং—ঢং—ঢং]

বিশ্বাস—শাহজাদী! শাহজাদী! আপনাকে দরবারে যেতে হবে।

[অনুসরণ করিল]

[ঘণ্টা বাজিয়া চলিল]

তৃতীয় দৃশ্য

[ঘণ্টা বাজিতেছে ঢং-ঢং-ঢং-ঢং। মহারাষ্ট্র দরবারের প্রশস্ত চত্বর। চারিদিকে চারটি থামের উপর ছাদ, নীচে আলিসার বেষ্টনী। চারিদিকে আসন। মধ্যস্থলে প্রশস্ত একটি আসনে বালাজীরাও বসিয়া উত্তর-ভারত অভিযানের নির্দেশনামা নীরবে পাঠ করিতেছেন। গোপন নির্দেশনামা তিনি নিজেই রচনা করিয়াছেন। সম্মুখে এক দিকে রঘুনাথরাও, অন্য দিকে সদাশিবরাও ভাও। বালাজী হাত তুলিয়া বলিলেন]

বালাজী—দরবারের ঘণ্টা এখন বন্ধ করতে বল। সদাশিব!

সদাশিব—(আগাইয়া গেলেন) এ—! বন্ধ কর ঘণ্টা।

[ঘণ্টা বন্ধ হইল। বালাজীরাও নির্দেশনামা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন]

বালাজী—শাহজাদী ফকিরিণী বেগম নসীবন্নেসার নামে দিল্লী দখল

হবে না। কার নামে দিল্লী দখল করবে, সে নির্দেশ আমি পরে পাঠাব। বাকি সমস্ত নির্দেশ এর মধ্যে রইল।

[নির্দেশনামা রঘুনাথের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। রঘুনাথ সদাশিব দুইজনেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিল]

বালাজী—বালিকাটির চরিত্র অত্যন্ত জটিল। আমার প্রস্তাবে সে সম্মতি দেয় নি। উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্রের মর্যাদা তোমার উপর নির্ভর করছে রাঘব।

রাঘব—আমার জীবন দিয়ে সে মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করব মহামান্য পেশবা।

বালাজী—লাহোরে আবদালীর পুত্র তৈমুর শাহ আবদালীর উপর প্রচণ্ডতম আঘাত হানবে। সমগ্র উত্তর-ভারতে যেন একটি আফগান পাঠান না থাকে। এর চেয়ে বড় সুযোগ আর আসবে না মনে রেখো। সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে এক বিচিত্র দৈববাণীর মত এক রটনা—হিন্দুস্থানে আঁধিয়ারা নামছে, মুঘল বাদশাহী যাবে। বিগ্রহমূর্তি ফেটে বেরিয়ে আসবেন দেবতা নিজে। লোকে পরিবর্তন প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছে। প্রতিষ্ঠা মাত্রেই অনবরত মস্তকে মেনে নেবে।

[নির্দেশনামা দিলেন]

(প্রশ্নের সুরে বললেন) বাহিনীর যাত্রা শুরু হবে দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম পাদে মহাকালীর পূজারম্ভ হওয়া মাত্র?

রাঘব—(মাথা নত করিয়া সম্মতি জানাইয়া) হাঁ মহামান্য পেশবা।

বালাজী—তা হ'লে তুমি যাত্রা কর। আর একটি কথা একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি।—এবার আমরা চৌথ আদায়ে যাচ্ছি না। বিরুদ্ধ শক্তিকে কঠোর হাতে দমন করবে। অথচ সাধারণের উপর যেন অত্যাচার না হয়। উত্তর-ভারতে দুটি প্রবল শক্তির

সহযোগিতা পাবে। গোস্বামী সৈন্যদের সাহায্য আর ব
চাষীদের আনুগত্য। যাও—শিবাস্তে পন্থানঃ!

[রাঘব অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল]

সদাশিব, দাক্ষিণাত্যের ভার তোমার উপর। সর্বাগ্রে নিজ
তুমি যাত্রা করবে ত্রয়োদশীতে?

সদাশিব—হাঁ!

[বাহির হইতে নরিন্দর গিরির কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

নরিন্দর—(নেপথ্য হইতে) নমো নারায়ণায়! ভাই পণ্ডিত নানা
রাও; পেশবা বালাজী রাও! (প্রবেশ করিলেন)

বালাজী—(উঠিয়া) নমো নারায়ণায়! নমস্তে গিরি মহারাজ!

নরিন্দর—আনন্দ রহো ভাই! আনন্দ রহো! কল্যাণ করুন কল্যাণ
দেবতা।

বালাজী—আসন গ্রহণ করুন মহারাজ।

নরিন্দর—কর্মে ব্যাঘাত করলাম পেশবা?

বালাজী—না গোস্বামীজী, আমি আপনারই প্রতীক্ষাই করছিলাম।

নরিন্দর—পাণ্ডিত্যের ফলে এই বাক্য আর ব্যবহার বড় উজ্জ্বল হয় ভ
পণ্ডিত। (আসনে বসিলেন) আমি একটু ব্যস্ত হয়ে বি
আগেই হয়তো ঢুকলাম। জাঠ সর্দার জবাহির আর তা
একজন সঙ্গী আমার সঙ্গে এসেছে তোমার আহ্বানে, তাে
কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি ভাই। গ্রাম্য চাষী তারা, নগরে এ
পীড়া অনুভব করছে। তার উপর জবাহির এখনও অসু
তাদের শীঘ্র বিদায় কর। একটু অধীর হয়েছে তারা।

বালাজী—আজই দরবারে তাদের আহ্বানের ব্যবস্থা করেছি মহারা
তাদের কথা আমি ভুলি নি। সদাশিব, তুমি তাদের নিয়ে এ

[সদাশিবের প্রস্থান]

বালাজী—মারাঠা তো অগ্রসর হ'ল গিরি মহারাজ। আপনাদের সক্রিয় সাহায্য আমি প্রত্যাশা করব।

নরিন্দর—পণ্ডিত, তোমাকে ভাই আমি ভালবাসি। বিপদে ভ্রমে আমি ভাই তোমার পাশে এসে দাঁড়াব। কিন্তু গিরিদের সম্পর্কে গুরুর নির্দেশ আছে। সে অমান্য করতে পারব না। গুরুর আদেশ—রুদ্রের আবির্ভাব না হ'লে তোমরা অস্ত্র ধরবে না। রুদ্র কি জেগেছেন ভাই পণ্ডিত?

বালাজী—আপনারা দিব্য-দৃষ্টি দিয়ে দেখেন—

নরিন্দর—না না ভাই, দিব্য-দৃষ্টি না, অলৌকিক শক্তি না, জ্যোতিষ গণনা না। ও সব কিছু নয় ভাই। আমি বুঝি মন দিয়ে। সাধারণ জীবের মত। আমাদের আশ্রমে একটা বিড়াল ছিল, বিপদ আসবার আগে সেটা কাঁদত। কেমন মন দিয়ে বুঝতে পারত। আমার বুঝা ভাই তাই। আফগান এল ভাই, বুকের ভিতরটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। বাস্, বুঝলাম রুদ্র জেগেছেন। উঠে দাঁড়ালাম। আমি হারিয়ে গেলাম। সে তুমি দেখেছ। আমার সেই মন দিয়ে বুঝা ভাই।

বালাজী—আমার তো সে মন নেই মহারাজ, আমি বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে বুঝি। আমার বিচারে আমি বুঝেছি, ভারতবর্ষে একটা বিপর্যয় আসন্ন। এ বিপর্যয়ে যে প্রচণ্ডতম আঘাত হানতে পারবে, সে-ই প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আমি সর্বাগ্রে সেই আঘাত হানব। সময়ের দিক থেকে অত্যন্ত সুসময়। প্রবাদে গুজবে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। মহারাষ্ট্রকে আমি রুদ্রভাবে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলেছি।

নরিন্দর—তাই তো আমার প্রশ্ন। পেরেছ? জেগেছেন তিনি?

বালাজী—আজই চোখে দেখতে পাবেন। মহারাষ্ট্র বাহিনী যাত্রা করবে।

নরিন্দর—দেখি ভাই। কিন্তু তোমার ভিতরে তাকে দেখছি কই? সে যার ভিতর নাচে পণ্ডিত, দেখেছিলে আমার সেদিনের নাচন—সে কি আমার নাচন ভাই, সে তার নাচন।

বালাজী—না মহারাজ, নেচে কোন কাজ আমি করি না। আমার আদর্শ কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ।

নরিন্দর—শঙ্কর! শঙ্কর! শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন—ভগবান আমি; কিন্তু ভাই দ্রৌপদীর অপমানে দাসত্বের অমর্যাদায় শঙ্কর যদি রুদ্ররূপে পাণ্ডবদের বুকে না জাগতেন তবে কি কুরুক্ষেত্র হ'ত? তাই তো বলছি ভাই, উত্তর-ভারতে আফগান যাদের বুকে রুদ্রকে জাগিয়ে দিয়ে গেল, তাদের নিয়ে যাত্রা কর। সেই জন্যেই জবাহিরকে নিয়ে এসেছি আমি।

[সদাশিবের প্রবেশ]

সদাশিব—মহামান্য পেশবা! জাঠ সর্দার জবাহির সিং।

[জবাহির ও তাহার সঙ্গী প্রবেশ করিল। জবাহির বিভ্রান্তের মত দাঁড়াইল]

নরিন্দর—জবাহির! ইনি পেশবা।

জবাহির—হাঁ? পেশবা মহারাজ? হিন্দুপাদ পাদশাহীর প্রথম ব্রাহ্মণ শাহানশাহ?

[জবাহির সিং পল্লীবাসী জাঠ; সে মারাঠা রাষ্ট্রনায়ককে সম্মুখে পাইয়া কথা বলিতে বলিতেই মুগ্ধের মত অগ্রসর হইয়া গেল তাঁহার আসনের দিকে। বালা রাও হাত তুলিলেন। তাঁহার নিষেধ-ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল না। জবাহির কিছু অন্যায় হইতেছে না বুঝিয়াও থামিয়া গেল]

বালাজী—জাঠ সর্দার, তোমরা মথুরা রক্ষার জন্যে আফগানের

সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছ, সে যুদ্ধ আমি দেখেছি। ধর্মের জন্য, দেবতার জন্য তোমরা যে আত্মোৎসর্গ করেছ, তার প্রকৃত পুরস্কার দেবেন ঈশ্বর। আমি হিন্দু-ভারতের নেতা, আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি বীর, মহাবীর। তোমার বাপ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে। তোমাকে আমি পুরস্কার দেব।

[জবাহির অবাক হইয়া শুনিতেছে। সহসা সদাশিব রাও ভাওয়ের ঝাঁকিতে সে চমকিয়া উঠিল। ভাও আসিয়া তাহার কাঁধে ধরিয়া ঝাঁকি দিলেন]

সদাশিব—এ জাঠ জোয়ান! (ঝাঁকি দিলেন)

জবাহির—(চমকিয়া উঠিল) অ্যাঁ!

সদাশিব—মহামান্য পেশবাকে প্রণাম কর।

নরিন্দর—ভাও সাহেব, এ জাঠ জোয়ানের মস্তিষ্ক কিছু অসুস্থ। মথুরার যুদ্ধে আঘাত পেয়েছিল মাথায়। এখনও ঠিক সুস্থ হতে পারে নি। তুমি ওকে ছেড়ে দাও, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ওকে। জবাহির! বেটা! পেশবা মহারাজকে পর্‌ণাম কর।

জবাহির—হাঁ, হাঁ। [সে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল, এবং সেই অবস্থাতেই হাত জোড় করিয়া বলিল] বাবা পেশবা, ব্রাহ্মণ শাহনশাহ, কসুর আমার মাফ কর বাবা দেওতা।

বালাজী—ওঠ তুমি, ওঠ জাঠ জোয়ান। উঠে দাঁড়াও।

[জবাহির উঠিয়া দাঁড়াইল]

বালাজী—জাঠ জোয়ান জবাহির, শুধু তুমি দেবতার জন্য যুদ্ধ করার পুণ্য এবং গৌরব অর্জন কর নি—বিপন্ন নারীকে রক্ষা ক'রে সে পুণ্য এবং গৌরবকে উজ্জ্বলতর ও মহত্তর করেছ। তুমি বিপন্ন শাহজাদী নসীবন্নেসাকে রক্ষা করেছ। তার জন্য শাহজাদী নিজে তোমাকে স্বতন্ত্র ভাবে পুরস্কার দেবেন।

জবাহির—[বিস্মিত হইয়া নরিন্দরের দিকে চাহিল] শাহজাদী? গুরু মহারাজ—

[নরিন্দর হাত তুলিয়া তাহাকে স্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন]

বালাজী—(বলিয়াই গেলেন ; ভিতরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন) কুমার বিশ্বাস রাওকে সংবাদ দাও, আমরা শাহজাদীর জন্ত অপেক্ষা করছি।

[কথা শেষ করিয়া তিনি পাশের কর্মচারীর দিকে চাহিলেন, সে তাঁহার হাতে একখানি তলোয়ার ও একটি মুদ্রাপূর্ণ থলি তুলিয়া দিল]

বালাজী—জাঠ সর্দার, এই ধর তোমার পুরস্কার। ওই তরবারি আর এক সহস্র মুদ্রা।

[জবাহির অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইল]

নরিন্দর—ব'সে যাও বেটা। হাঁটু গেড়ে ব'সে নিতে হয় ইনাম।

[জবাহির বসিল]

নরিন্দর—(স্মিতহাস্যে বলিলেন) হাঁ।

জবাহির—(পুরস্কার লইয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল) এ—বাবা পেশবা মহারাজ-কি জয়!

বালাজী—(হাসিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে নীরব করিলেন) জাঠ সর্দার! তোমার সমস্ত জাঠ ভাইদের গিয়ে বলবে, আর তাদের চিন্তা থাকবে না, আবার মারাঠা পেশবা গো-ব্রাহ্মণ-দেবতা রক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। শুধু তাই নয়, যে অত্যাচার ক'রে গেছে আফগান, তারও প্রতিকার আমি করব। রোহিলখণ্ডের যে সমস্ত রোহিলা আফগান যোগ দিয়েছিল এই অত্যাচারে, তাদের শাস্তি দেব আমরা। তোমাদের জাঠ চাষীদের কিন্তু সংযত হতে হবে। হিন্দুপাদ পাদশাহীর প্রতিষ্ঠায় আমাদের

প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে ; আমাদের সাহায্য করতে, আমাদের আদেশ প্রতিপালন করতে তারা যেন সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

জবাহির—হাঁ বাবা থাকব। মানব হুকুম তোমার। কিন্তু বাবা পেশবা, মারাঠা পল্টনকে তুমি হুকুম দাও বাবা, তারা যেন গরীবদের উপর—

বালাজী—(বুঝিলেন জবাহির কি বলিতেছে, তিনি গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইল, তিনি মধ্যপথে বাধা দিয়া বলিলেন) আশ্বাস আমি দিয়েছি জাঠ সর্দার।

[ঠিক এই সময়েই নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইল]

বালাজী—(ধ্বনি শেষ হইতেই বলিলেন) তুমি তোমার স্থানে গিয়ে দাঁড়াও সর্দার—ওইখানে।

[জবাহির ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে দাঁড়াইল। তলোয়ারখানি কোমরে বাঁধিতে রত হইল। ওদিকে প্রবেশ করিল পুরোহিত, তাহার হাতে একখানি পূজার নির্মাল্য—ধান দূর্বা চন্দন। তাঁহার সঙ্গে একজন শঙ্খধারিণী, একজন পূর্ণকুম্ভ ও একজন ঘণ্টা ধারিণী প্রবেশ করিল। আরও প্রবেশ করিল মারাঠা প্রধানগণ—হোলকার সিন্ধিয়া প্রভৃতি। বালাজী রাও দাঁড়াইয়া উঠিলেন]

পুরোহিত—পেশবা, মহালক্ষ্মীর পূজা শেষ হ'ল। মহাশক্তির পূজা আরম্ভ হবে। যাত্রার লগ্ন উপস্থিত। মহালক্ষ্মীর আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

[পেশবা দরবার-মণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিয়া সম্মুখে মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইলেন। পুরোহিত ধানদূর্বা এবং নির্মাল্য মাথায় ধরিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন]

[সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টা বাজিল]

পুরোহিত—গম্যতাম্ অর্থলাভায়, ক্ষমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষঃ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ॥

জবাহির—(সঙ্গে সঙ্গে পরমোৎসাহে ধ্বনি দিয়া উঠিল ; ঠিক মধ্যস্থলে

আসিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল) এ—
ব-লো ভা-ই মথুরানাথ-কি জয়—! রাধারাণী-কি—জয় !

২য় জাঠ—জয় ! জয় ! (জয়ধ্বনি দিল)

সদাশিব—(ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন) এইসা নেহি রে জাঠ চাষা। ইয়ে দরবার হ্যায়।

[আগাইয়া আসিয়া জবাহিরের কাঁধ ধরিয়া আবার ঝাঁকি দিলেন]

নরিন্দর—(আপন আসনে বসিয়া ছিলেন এতক্ষণ, তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন) ভাও সাহেব, আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—যুবক রুগ্ন।

সদাশিব—গোস্বামীজী তার রোগের সন্ধান যতটা পেয়েছেন—আমি তার চেয়ে আরও অনেক বেশি রোগের সন্ধান পেয়েছি। মূর্খতা এবং বর্বরতা এ দুটো ব্যাধির সন্ধান পেয়েও আপনি গ্রাহ্য করেন নি। হিন্দুপাদ পাদশাহীর অর্থ—বর্বর মূর্খের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা নয়।

নরিন্দর—(এবার অগ্রসর হইবার জন্য পা বাড়াইলেন) শঙ্কর ! শঙ্কর !

সদাশিব—মহামান্য পেশবা, আপনি এই চাষাদের সহযোগিতা নিয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছেন ?

বালাজী—সদাশিব ভাও, তোমার স্থান গ্রহণ কর তুমি। গিরি মহারাজ এইবার আশীর্বাদ করবেন। সদাশিব !

[সদাশিব স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন। ওদিকে গিরি নামিয়া আসিতেছিলেন, বালাজী তাঁহার সম্মুখে গিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিকে দাঁড়াইতে হইল]

আশীর্বাদ করুন গিরি মহারাজ।

নরিন্দর—(আকাশের দিকে চাহিয়া উপরের দিকে হাত তুলিয়া) সত্য জয়তে ! পণ্ডিত, পেশবা, আমি আশীর্বাদ করি, সত্যের জয় হোক। শিবমেব জয়তে, মঙ্গল প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। পৃথিবী সুন্দর হোক, সুন্দরমেব জয়তে, সুন্দরের জয় হোক।

সদাশিব—(প্রতিবাদের সুরে বলিয়া উঠিলেন) আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—মারাঠার জয় হোক। হিন্দুপাদ পাদশাহীর প্রতিষ্ঠা হোক, অক্ষয় হোক সে—

[একটা ধাতুপাত্র পতনের ঝনঝন শব্দে দরবার ভরিয়া গেল ; সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন। সদাশিব কথা শেষ করিতে পারিলেন না। বালাজী রাও দ্রুত অগ্রসর হইয়া দরবার ও অন্দরের মধ্যবর্তী প্রবেশ-পথের পর্দা অপসারিত করিয়া দিলেন। দেখা গেল, বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—নসীবন্নেসা বেগম। তাঁহার হাত হইতে একখানা থালা পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বাস রাও মেঝে হইতে থালাখানি ও মুদ্রাপূর্ণ থলি কুড়াইয়া তুলিতেছেন]

নসীবন—মহামান্য পেশবা ! আমার লজ্জার সীমা নাই। আমি চকিত ক'রে তুলেছি সকলকে। রমজানের উপবাস ক'রে শরীর আমার দুর্বল হয়েছে ; কিন্তু এতখানি দুর্বল হয়েছে তা আমি বুঝতে পারি নি। হাত থেকে থালাখানা প'ড়ে গেল।

বালাজী—এখন সুস্থ বোধ করছ ?

নসীবন—হ্যাঁ পেশবা। (হাসিয়া) এখন যদি আমার হাতে মরণের পরোয়ানাও তুলে দেন, তাও হাত পেতে নিতে আমার হাত কাঁপবে না।

নরিন্দর—এই তো তুমি দুনিয়ার লড়ায়ে জিতে গেলে বেটী, মরণকে সুন্দর দেখতে পেলে তুমি।

নসীবন—গিরি মহারাজ ! আমার সালাম গ্রহণ করুন হজরত।

গিরি—আনন্দ রহো ! আনন্দ রহো বেটী !

[জবাহির বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নসীবনের দিকে চাহিয়া ছিল]

জবাহির—(মৃদুস্বরে বলিতেছিল) রাধারাণী ? রাধারাণী ?

বালাজী—(ঘোষণার সুরে বলিলেন) এইবার শাহজাদী বেগম স্বহস্তে পুরস্কৃত করবেন জাঠ বীর জবাহিরকে। বীর জবাহির তাঁকে

রোহিলা পাঠানের হাত থেকে রক্ষা ক'রে সারা হিন্দুস্থানের মর্যাদা রক্ষা করেছে। (নসীবনকে) এস মা, এখানে দাঁড়াও।

জবাহির—(এতক্ষণে যেন স্মরণ করিয়াছে—এইভাবে হঠাৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইল) রাধারাণী! রাধারাণী! হাঁ হাঁ, তুমি সেই রাধারাণী।

বিশ্বাস রাও—(নিজের তলোয়ার খুলিয়া পথ রোধ করিল) জবাহির সিং!

জবাহির—(নিজের কোষের তলোয়ার খুলিতে গিয়া—খানিকটা টানিয়া—বিশ্বাস রাওয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া তলোয়ার ছাড়িয়া দিয়া মুগ্ধকণ্ঠে কহিল) আ—হা—হা! তুমি! তুমি কি মথুরানাথ? রাধারাণীকে রক্ষা করতে, এতদিনে তলোয়ার ধরতে মনে পড়েছে? হায় মথুরানাথ, সে দিন তারা যখন এল মশাল জ্বালিয়ে দানার মত—আ, তখন যদি তুমি এমনি ক'রে দাঁড়াতে মথুরানাথ!

বালাজী—(মধ্যস্থলে আসিয়া জবাহির সিং, উনি পেশবাকুমার বিশ্বাস রাও।

জবাহির—পেশবা যুবরাজ! পরণাম।

বালাজী—বিশ্বাস রাও, তুমি স'রে দাঁড়াও। জবাহির সিং, তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও। শাহজাদী তোমাকে ইনাম দেবেন।

জবাহির—ইনাম দেবেন? কে? রাধারাণী?

নসীবন—জাঠ জোয়ান, আমি মুসলমান। তোমাদের দেবীর নামে আমাকে ডেকো না।

জবাহির—না, না। তুমি রাধারাণী—

নসীবন—ধর, ইনাম ধর।

জবাহির—না।

বালাজী—জাঠ যুবক !

[নসীবনের হাতে থালা কাঁপিতে লাগিল। বালাজী ধরিলেন]

নরিন্দর—জবাহির !

জবাহির—না—না—না। রাধারাণীকে বাঁচানোর দাম—ইনাম—নিতে আমি পারব না।

বালাজী—জবাহির !

জবাহির—না—না—না। কি জবাব দেব আমি ভগবানকে ? কি বলব আমি আমার দেমাককে, আমার মেজাজকে ? না—না—না।

[সে ছুটিয়া চলিয়া গেল]

[বাহির হইতেও শোনা গেল—না—না—না। জাঠ সঙ্গীও ছুটিল—সর্দার ! সর্দার !]

[ঠিক সেই মুহূর্তেই বাহিনীর যাত্রার বাদ্যধ্বনি বাজিয়া উঠিল। বালাজী হাত তুলিলেন]

বালাজী—চঞ্চল হ'য়ো না কেউ।

[নরিন্দর গিরি মহারাজ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন]

[বাদ্যধ্বনি বাজিয়া চলিল বাহিনীর অগ্রগমন ঘোষণা করিয়া]

বালাজী—সদাশিব, মলহর রাও, বিশ্বাস রাও, বাহিনী বোধ হয় তোমাদের প্রতীক্ষা করছে।

[নসীবন্নেসা, বালাজী রাও ও নরিন্দর ব্যতীত সকলে চলিয়া গেলেন]

[বাদ্যধ্বনি অগ্রসর হইল]

নরিন্দর—পণ্ডিত ! আমাকে বিদায় দাও ভাই। আমি চললাম। (হঠাৎ তিনি যেন নড়িয়া উঠিলেন)

বালাজী—নমস্তে গিরি মহারাজ ! আমার প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি। দুঃখ করি না। তবে আপনাকে পেলে আনন্দ হ'ত।

নরিন্দর—(চলিতে চলিতে দাঁড়াইলেন) আনন্দ রহো ভাই। আনন্দ

রহো। দুখ কেন করবে? আনন্দ করো! আনন্দ রহো।

(চলিলেন)

নসীবন—দাঁড়ান হজরত।

নরিন্দর—বেটী! (দাঁড়াইলেন)

নসীবন—আপনি কি মথুরা ফিরবেন? আমি দিল্লী ফিরব। আপনার সঙ্গে আমি মথুরা পর্যন্ত যেতে চাই। সেখান থেকে আমি গুরুর কাছে চ'লে যাব।

বালাজী—মা! এখানে থাকতে কি বেদনা অনুভব করছ?

নসীবন—জনাব, সেখানকার জন্য বেদনা অনুভব করছি। দিল্লীর বাদশাহী তখ্‌ত থেকে বাবরশাহী বংশ যদি নামে, তবে সে চোখে দেখে কাঁদতে পাব না? তা ছাড়া—

বালাজী—কি মা?

নসীবন—লজ্জা করব না পেশবা। সত্যকে প্রকাশ করব। বাবরশাহী বংশের রক্ত তার সমস্ত দোষ-গুন ধর্ম-অধর্ম নিয়ে আমার কলিজায়, আমার সর্বদেহে আজ টগবগ ক'রে ফুটে উঠেছে। মুসলমানের বাদশাহী ঘুচিয়ে হিন্দুপাদ পাদশাহী প্রতিষ্ঠার কথা শুনে ইচ্ছে হচ্ছে—উন্মাদ হয়ে যাই। তা ছাড়া বাবরশাহী রক্তের রূপতৃষ্ণা ভোগতৃষ্ণা আজ আমার—পেশবা—

বালাজী—আমি ব্রাহ্মণ, আমি আশীর্বাদ করি তোমার রক্তধারা শান্ত হোক, পবিত্র হোক।

নরিন্দর—চল বেটী, আমি তোমাকে দিল্লী পৌঁছে দিয়ে তবে মথুরায় ফিরব।

[নসীবন ও নরিন্দর চলিয়া গেলেন। বালাজী দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাদ্যধ্বনি একবার বাজিয়া দূরে চলিয়া গেল। একে একে বাতিগুলি নিবিতে লাগিল। অন্ধকার হইতে লাগিল]

[পরবর্তী দৃশ্যের অন্ধকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া দৃশ্য আবৃত হইল। বাজনাও দূরে মিলাইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য

পুরান দিল্লীর একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত দরগা

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার

[শাহজাদা মহি-উল-মিল্লাত দিল্লীতে ফিরিয়া এই দরগার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। সূচনার মধ্যে পূর্ববর্তী দৃশ্যের অন্ধকার ফুটিয়া উঠিল। তাহারই মধ্যে এই দৃশ্য প্রকাশিত হইল। দরগার ফটকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মিল্লাত]

মিল্লাত—(মৃদুস্বরে) কে? কে? মুসাফের, তুমি কে?

[দৃশ্যপটের মধ্যস্থলবর্তী দরগার দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন শাহফানা]

শাহফানা—আমি মিল্লাত।

মিল্লাত—কে? তুমি কে?

ফানা—আমি। শাহফানা।

[মিল্লাত প্রবেশ করিল]

মিল্লাত—হজরত! আঃ! প্রতি মুহূর্তে আপনার প্রত্যাশা করছি আজ তিন দিন।

ফানা—মাত্র আজ সকালে তোমার খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। যে ভিক্ষুক খবর দিলে সে শুধু বললে—ফরাক্কাবাদের গাঁওয়ের আস্তানায় যে ফকিরকে পাঠিয়েছিলেন, ভূমিকম্পের দিন যে ফকির রওনা হয়েছিল সে ফকির ফিরেছে। এই দরগার কথা বললে।

মিল্লাত—ও ছাড়া আর কি ব'লে পাঠাব?

ফানা—বুঝলাম, তুমি। কিন্তু সারাদিনে বের হতে সাহস হ'ল না। শিয়ালের মত ধূর্ত আমিদুল মুল্ক আমার পিছনে চর লাগিয়ে

রেখেছে। ওদিকে আবদালীর গোলাম নাজিবখাঁর কালাপোশ সিপাহী ঘুরছে রাস্তায় রাস্তায়। শেষ সন্ধ্যার নামাজের আগে আমিদুলের চরটার নসীব গুনে বলবার ছলে ডেকে ভুলিয়ে সিরণীর সঙ্গে মাদক খাইয়ে অজ্ঞান করিয়ে বেরিয়েছি। আসছি দিল্লীর যে অঞ্চলে জ্বরের মহামারী চলছে সেই পথ ধ'রে। আজও দিল্লী কাঁদছে মিল্লাত। আবদালীর হত্যাকাণ্ডের পর দুর্ভিক্ষ—তারপর শুরু হয়েছে অদ্ভুত এক বুখার—প্রবল জ্বর আসছে, যে মরছে সে বাঁচছে, যে বাঁচছে সে হয় হারাচ্ছে চোখ, নয় হারাচ্ছে মগজ—পাগল হয়ে যাচ্ছে। আজও রোজ রাত্রে আমি যেন কান্না শুনি। দিল্লী কাঁদে। তারপর? দীর্ঘদিন—আজ ছ মাস তোমাদের জন্য আমার উৎকণ্ঠার পরিসীমা নাই। মিল্লাত, নসীবন বেগম?

মিল্লাত—নসীবন হারিয়ে গেছে জনাব।

ফানা—(মিল্লাতকে ধরিয়া) মিল্লাত!

মিল্লাত—হজরত! আজ এই ছ মাস আমি মথুরার চারিদিকে—ফকির সেজে দোরে দোরে ভিক্ষার ছলে ঘুরে বেড়িয়েছি। পাই নি। শুধু এইটুকু শুনেছি—এক ব্রাহ্মণ তাকে আশ্রয় দিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু মথুরা থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত কোথাও পাই নি।

ফানা—তুমি? তুমি কি করছিলে মিল্লাত? কি ক'রে হারাল সে? মিল্লাত!

[তাহার কাঁধ ধরিয়া আবার ঝাঁক দিলেন]

[বাহিরে বাহকের হাঁক শোনা গেল]

মিল্লাত—ফকির সাহেব ভিতরে চলুন। ডুলিতে কেউ যাচ্ছে পথে।

[উভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন]

[পাল্কির শব্দ মিলাইয়া গেল ক্রমশ]

[উভয়ে আবার ফিরিলেন]

মিল্লাত—(কথা বলিতে বলিতে ফিরিলেন) সে এক প্রলয়। তারই মধ্যে হজরত পাগলের মত 'আমি মরব—আমি মরব' ব'লে ছুটে বেরিয়ে গেল।

ফানা—ছুটে বেরিয়ে গেল, ছুটে বেরিয়ে গেল! তার জন্য আবদালীকে মুঘল হারেমের ষোল-ষোল জন বেটী-বহু ঘুষ দিতে হয়েছে। বড়ি হজরত বেগম, মালকাই জমানি, সাহেবাই জমানি, সুহরত-উন্নিসা, আঃ—ষোলজন বেগমকে সে নিয়ে গেল! আর তুমি তাকে হারিয়ে এলে?

মিল্লাত—কি করব জনাব? আমি তাকে ধরেছিলাম, সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চ'লে গেল। আমি ছুটলাম পিছনে। কিন্তু বৃদ্ধ আমি, কতটুকু আমার শক্তি? অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন, একটা গাছের শিকড়ে পা বেধে প'ড়ে গেলাম, মাথায় চোট লাগল, বেহোঁশ হয়ে গেলাম। হোঁশ হ'ল তিন দিন পর। তখন লড়াই শেষ। যমনার জল পচেছে, আবদালীর ফৌজের মধ্যে বেমার ঢুকেছে; এক লোটা পানি নিয়ে সে আগ্রা ফিরেছে। আমি পাগলের মত চারিদিক খুঁজলাম, কিন্তু কোথাও পেলাম না। সে তখন হারিয়ে গেছে। শুনলাম এক ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে গেছে।

ফানা—সে মরে নি কি ক'রে জানলে তুমি? এক ব্রাহ্মণ তাকে আশ্রয় দিয়ে নিয়ে গেছে—কে বললে তোমাকে?

মিল্লাত—গিরি গোস্বামীদের আশ্রমের একজন গোস্বামী।

ফানা—(বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সভয়ে বলিল) গিরি গোস্বামী! কে? কে?

মিল্লাত—নরিন্দর গিরি গোস্বামীর এক চেলা।

ফানা—আঃ। (আতঙ্কে অস্ফুট শব্দ করিল) নরিন্দর গিরি গোস্বামী!

এক যাদু জানে নরিন্দর, জ্যোতিষ মানে না। সে—সে তাকে লুকিয়ে রাখে নি তো?

মিল্লাত—তাকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম হজরত। সেও বললে—একজন ব্রাহ্মণ তাকে নিয়ে গেছে। অনুনয় ক'রে বললাম—কে সে? কি তার ঠিকানা? বললে—যা বলেছি, তার বেশি বলতে পারব না মুসলমান, অনুরোধ ক'রো না। তবে নিশ্চিন্ত থাক, বেটী তোমার নিরাপদে আছে। তবু আমি খুঁজে বেড়ালাম গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে—

ফানা—(ব্যঙ্গ করিয়া) গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে! সব ঝুট—সব ঝুট! নরিন্দর গিরি—এ সেই নরিন্দর গিরি তাকে গায়েব ক'রে রেখেছে। ভয়ঙ্কর এই হিন্দু ফকিরেরা, যাদু জানে, মুর্দা খায়, ঔরৎ নিয়ে সাধনা করে। মিল্লাত! আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোকে আমি খুন করি।

[বোরখা পরিয়া নিঃশব্দে আমিদুল মুল্ক প্রবেশ করিল। মিল্লাত সাহফানা জানিতে পারিল না। বোরখা খুলিয়া সে বলিল]

আমিদ—ফকির সাহেব! শাহজাদা মিল্লাত!

উভয়ে—কে?

আমিদ—আমি, আমিদুল মুল্ক।

ফানা—(ধীরে ধীরে সবিস্ময়ে) সাহাবুদ্দীন—আমিদুল মুল্ক!

আমিদ—হ্যাঁ, আমি। আমার চরটা সিরণীর মাদকে বেহোঁশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু আমার হোঁশ হারায় নি ফকির। আমি পিছনেই আছি আপনার। পাছে সন্দেহ হয় ব'লে ডুলি চ'ড়ে বোরখা প'রে এসেছি। আমি জানতাম—আপনাদের দুজনকে একসঙ্গেই পাব। শাহফানা, শাহজাদা মিল্লাত!

ফানা—(তিক্তস্বরে) উজীর, তুমি কেন—কেন আমার পিছনে চর লাগিয়েছ ?

আমিদ—ফকির, আপনি বাদশাহির ছক নিয়ে সতরঞ্চ খেলছেন নসীবের সঙ্গে। ওই একই ছকে—আমিও খেলছি আবদালীর সঙ্গে—মারাঠার সঙ্গে, বাদশাহীর খেল। আপনার খেলার উপর আমার নজর না রাখলে চলে ?

ফানা—না না আমিদুল মুল্ক, আমি ও-খেলা খেলতে চাই না। আমি হিন্দোস্তানে শান্তি চাই। বাবরশাহী বাদশাহীর ভাগ্যে বড় দুর্যোগ। আমি হজরত বেগমের ভাগ্যে শুভযোগ দেখে তাকে বসিযে তখ্‌ত কায়েম রাখতে চেয়েছিলাম। আর হজরতকে আমি বড় ভালবাসি—সন্তানের মত।

আমিদ—হজরত বেগমকে আমি খুঁজে বার ক'রে দেব। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

ফানা—নরিন্দর গিরি গোঁসাইকে ধর আমিদুল মুল্ক—এখুনি খবর বেরুবে।

মিল্লাত—সে জানে সেই ব্রাহ্মণের পরিচয়।

আমিদ—আমি তাকে এনে, ফকির, তোমার পায়ে আছড়ে ফেলে দেব। আজ শাহজাদা মিল্লাতকে আমার চাই। শাহজাদা মিল্লাত, তোমাকে আমার প্রস্তাবে রাজী হতে হবে।

মিল্লাত—বল আমিদুল মুল্ক, বল।

আমিদ—তুমি হলফ ক'রে বল ফকিরের সামনে। প্রস্তাব জেনে রাজী না হ'লে আমার পক্ষে বিপদ। সে ক্ষেত্রে তোমার গলা চিরদিনের মত বন্ধ করতে হবে। ফকির সাহেবকেও আটক করতে হবে মাটির তলার ঘরে—অন্ধকূপে।

মিল্লাত—বল আমিদুল, বল।

আমিদ—তোমাকে তখতে বসতে হবে। মহিমুদ্দীন আলমগীর আর-

দালীর মেহমান হয়ে আমার পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। বাদশাহী থেকে নামাব তাকে আমি।

মিল্লাত—না না না।

আমিদ—শাহজাদা মিল্লাত, এ কথা শোনার পর 'না' বললে চলবে না। বাদশা আহমদ শাকে আমি অন্ধ করেছিলাম।

মিল্লাত—আমাকে হত্যা কর তুমি আমিদুল—

আমিদ—শুধু তোমাকে নয়, শাহফানাকে বন্দী করতে হবে অন্ধকূপে।

ফানা—আমিদুল মুল্ক!

আমিদ—ফকির সাহেব!

[নেপথ্যে শব্দ]

ফানা—কিন্তু কেন? মিল্লাতকে এ বিপদে ফেলছে কেন?

আমিদ—আবদালীর মেহমান, আবদালীর স্তাবক আলমগীরকে সরাতেই হবে আমাকে। আবদালী যে অপমান আমার করেছে, তার শোধ আমি নেব। আমাকে পায়ে ক'রে ঠেলে দিয়েছে, বংশ তুলে গাল দিয়েছে। আমি নিজামউল মুল্ক চিন কিলিচ খাঁর বংশধর, আমরা তিন পুরুষ হিন্দোস্তানের উজীর—এক শাখা হায়দরাবাদের নিজাম। আর আবদালী, ষোল বছর আগে সে ছিল নাদিরশাহের ছিলমবরদার। নাদিরশা যখন দিল্লীতে এসেছিলেন, তখন পূর্বপুরুষ নিজাম আসফ শাহ ছিলমবরদার আবদালীর নসীব দেখে, একদিন বাদশাহ হবে ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাই শুনে শাহ নাদির ছুরি দিয়ে দুটো কান কেটে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন—নাদিরের গোলামির পরিচয় কায়েম ক'রে রেখে গেলাম। সেই আবদালী। আমাকে লাথি মেরেছে—গন্না বেগমকে আমি পিয়ার করতাম, তাকে বাঁদী করতে চেয়েছিল। সে ম'রে জুড়িয়েছে।

মিল্লাত—না না, সে মরে নি আমিদুল, তুমি তার খোঁজ কর।

আমিদ—ফুরসৎ নাই শাহজাদা। অনেক লড়াই আমাকে করতে হবে। একটা তয়ফাওয়ালীর বেটীর মোহে ঘুরবার আমার ফুরসৎ নাই। গোটা হিন্দুস্থানকে ফকির ক'রে দিয়ে গিয়েছে আফগান। জান ফকির, ত্রিশ হাজার হাতী উঠ বলদ খচ্চর গাড়িতে লুটের মাল ব'য়ে নিয়ে গিয়েছে নিজে একা আবদালী। গোটা দিল্লী শহরে একটা ঘোড়া নাই, ঘোড়া দুরের কথা ধোবি-দের গাধা পর্যন্ত নিয়ে গেছে মালবোঝাই ক'রে। এর শোধ আমাকে নিতে হবে। কিন্তু চারদিকে দুশমন আমার। আবদালী, মারাঠা, বাদশাহ, নাজিবখাঁ, ইন্তেজাম সুরজমল জাঠ, সুজাউদ্দৌল্লা নবাব—নবাব—সব—সব—সব। এদের সঙ্গে লড়াই দিয়ে জিতে বাঁচতে হবে আমাকে। শাহজাদা মিল্লাত—আমার উত্তর দাও।

মিল্লাত—ফকির সাহেব!

[নেপথ্যে শব্দ]

কণ্ঠস্বর—কৌন্ হ্যায়?

[ভিতরে আমিদুল উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই নিঃশব্দে, ফকির শাহফানা উপরের দিকে মুখ তুলিয়া গভীর চিন্তামগ্ন]

কণ্ঠস্বর—উজীর রিসালা। বাদকশাহী।

কণ্ঠস্বর—হিয়া কাহে? কৌন্ কাম?

কণ্ঠস্বর—তুমি কৌন?

কণ্ঠস্বর—রোহিল্লা কালাপোশ।

কণ্ঠস্বর—বেতমিজ! নেহি পহছানতে হেঁ? অঁ্যা?

কণ্ঠস্বর—হুজুর আলি—খোদাবন্দ—নবাব—নাজিব খাঁ বাহাদুর।

কণ্ঠস্বর—কার ভুলি ? ওয়াজীর আমিদুল মুল্কের ?

আমিদ—শাহজাদা ! নিজে নাজিবখাঁ আমার অনুসরণ করছে। বলুন—আপনার উত্তর। নইলে আপনি যাবেন, আপনার গুরু ফকির সাহেব যাবেন। আমার জন্যে ভাববেন না।

মিল্লাত—তাই হবে উজীর। তুমি সিংহাসনে বসাবে—আমি বসব। তুমি আমাকে হত্যা করবে—আমি মরব।

আমিদ—ফকির সাহেব, আমার হাত দেখুন। শাহজাদা, আপনি এই বোরখাটা প'রে ওদিকে আড়ালে পর্দানসীন হয়ে বসুন। জলদি। (পোষাকের ভিতর হইতে একটা বোরখা লইয়া ছুঁড়িয়া দিল)

[বোরখা লইয়া মিল্লাত ভিতরে চলিয়া গেল। তাহার আসনে বসিয়া আমিদুল শাহ-ফানার সম্মুখে হাত বাড়াইয়া দিল। শাহফানা সচেতন হইয়া আমিদুলের মুখের দিকে চাহিল]

শাহফানা—নসীব কিসমৎ—অদ্ভুত আশ্চর্য উজীর আমিদুল মুল্ক! হিন্দুরা বলে অদৃষ্ট—নিয়তি, সে যাকে যে ফরমান দিয়ে দুনিয়ায় পাঠায়, সেই ফরমানের বাইরে যাওয়ার কারুর শক্তি নাই। মানুষ মনে করে, চেষ্টা করে, কিন্তু—(উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন)

[নাজিব খাঁ প্রবেশ করিল]

নাজিব খাঁ—তাজ্জব ! আরে বাপ ! ওয়াজীর ইমাদুল মুল্ক, গাজিউদ্দিন খান বাহাদুর, ফিরোজ জং, মীর বখশী, আমীর উলউমরা, নিজাউল মুল্ক, আসফ জা বাহাদুর !

আমিদ—(ঘুরিয়া) কে ? নবাব নাজিব খাঁ ?

নাজিব—হ্যাঁ ওয়াজির সাহাব। তারপর ফকির সাহেব, কি এমন

দেখলেন ওয়াজিরের হাতে, যাতে এমন উচ্চ হাসি নিয়ে আসে ?

আমিদ—ফকির সাহেব বলছিলেন যে, এমন যোগ আমার আসছে—অত্যন্ত শীঘ্র আসছে, যেদিন আমার মারাত্মক দুশমন আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদবে। আমি হাসব—এমনি ক'রে হাসব। (সে হাসিয়া উঠিল)

নাজিব—মানুষের দুশমন মানুষ, শেরের দুশমন শের, শিয়ারের দুশমন শিয়ার। একটা শিয়ার মরলে এত হাসির কি আছে ? শরম-কি বাত ! শরম-কি বাত !

আমিদ—শিয়ার না, নাজিব খাঁ, বান্দর, একটা বান্দর ! আজই—আজই মরেছে। আমার একটা শের আছে। আর আছে একটা বান্দর। এতদিন শেরটা খাঁচায় থাকত, তার উপর হয়েছিল জখম,—বান্দরটা রোজ তার লেজ ধ'রে টানত, শিকের ফাঁকে কান বেরলে টানত, খোঁচা মারত আর দাঁত বের করত। আজ শেরটার খাঁচার খিদমতগার ছিল না। বান্দরটার খেয়ালও ছিল না, যে জখম শেরটা সেরেও উঠেছে ; আজ বান্দর যেই টেনেছে লেজ, আর অমনি শেরটা খাঁচার দরজায় মেরেছে থাবা। ব্যস্। বুঝতে পারছ কি হ'ল ? সে শেরটার সে কি হাসি ! কি বলব তোমাকে ! পাঠানের মগজ কিছু মোটা—খুলেই বলি, খাঁচা ভেঙে শের বান্দরটাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

নাজিব—(তরোয়াল খুলিয়া) আমিদুল মুল্ক !

আমিদ—নাজিব খাঁ, হুঁশিয়ার। শেরকে যে শিকল দিয়ে বেঁধেছিল, সে আবদালী অনেক দূরে। শের শিকল ছিঁড়েছে।

নাজিব—আমিদুল, মনে আছে, একদিন তোমার গোটা হারেমকে পথে বের ক'রে দিয়েছিলাম? আবার তাই করব।

আমিদ—এবার আমার হারেমে মুঘলানীর বেটী আছে। নাজিব খাঁ, রোহিল্লার চেয়ে মুঘলানীর কদর আবদালীর কাছে কম নয়। আবদালী আগে তাকে বলত—বেটী; এখন বলে—তুই আমার বেটা।

নাজিব—(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল) তা হ'লে তুমি শাহ আবদালীর জেনানি বেটা মুঘলানী বেগমের মর্দানা বহুড়ী! কাল থেকে তা হ'লে মুঘলানীর বেটী উমধাকেই পাঠাও উজিরি করতে।

আমিদ—নাজিব খাঁ!

নাজিব—তোমাকে আমি নজরবন্দী করলাম উজির। খবর পেয়েছি, দেওয়ালীর দিন মারাঠা কাফিরেরা পঙ্গপালের মত উড়েছে চৌথ আদায় করতে আসছে। গোটা দেয়াব ছেয়ে ফেলেছে।

শাহফানা—মারাঠা আসছে? চৌথ? চৌথ?

[সে বসিয়া একটা খড়ি বাহির করিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে লাগিল]

নাজিব—(বলিয়াই গেল) তোমাকে আমি ছেড়ে রাখতে পারব না আমিদুল মুল্ক। চলো—ওঠো। তোমার বাদকশাহীদের গ্রেপ্তার করেছি আমি। তাদের আস্তানা মুঘলপুরা আমার পল্টন ঘেরাও করেছে। আর ফকির শাহফান—

[দূরে তোপের আওয়াজ হইল—একটি আওয়াজ]

তোপ? মুঘলপুরার বাদকশাহী লড়াই দিয়েছে? কালাপোশ! জলদি খবর নে—

নেপথ্যে কালাপোশ—যো হুকুম খোদাবন্দ।

নাজিব—কার নসীব গুনছ ফকির? আমার, না, তোমার নিজের?

শাহফানা—হিন্দোস্তানের নসীব গুনছি নাজিব খাঁ। কিসমতের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলছি। একদিকে দুরানী বাদশাহী—অন্যদিকে হিন্দু-পাদ পাদশাহী। বাবরশাহীর নসীব—আঁধিয়ারা! হিন্দোস্তানী মুসলমিনের নসীব আঁধিয়ারা।

[আবার পর পর দুই-তিনটি তোপের আওয়াজ হইল। নাকাড়া বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিল—মারাঠা! মারাঠা! মারাঠা!]

নাজিব—মারাঠা? দোয়াবে চৌথ আদায় ছেড়ে দিল্লী আক্রমণ করলে? সয়তানী রিসালা পঙ্গপাল, পশ্চিমঘাট পাহাড়ের ইন্দুর!

ফানা—হিন্দুপাদ পাদশাহী! হিন্দুপাদ পাদশাহী। এয়্ খোদা!

নাজিব—(ফানার কথায় কান না দিয়া মারাঠাদের একদফা গাল দিয়া মুহূর্ত কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া নাজিবের হাত ধরিয়া টানিলেন) উঠে এস উজীর! তোমাকে যেতে হবে মারাঠার তাঁবুতে; আবদালীর পয়জার খেয়েছ, তোমার অভ্যাস আছে; মারাঠার পয়জারও সহ্য হবে তোমার। দেখ কি চায় পঙ্গপালেরা! দোয়াবের সব্জীক্ষেত ছেড়ে দিল্লীতে মরতে এল কেন? দিল্লীর লালকিল্লা কচি পাতা নয়, লাল ফুল নয়, আগুন—আগুন। পাখা পুড়ে মরবে। এস—

আমিদ—দাঁড়াও নাজিব খাঁ। আমার মা আছেন সঙ্গে।

নাজিব—তোমার মা! ডুলিতে তোমার মা এসেছেন! আ, তোমার বলা উচিত ছিল ওয়াজীর! এ—ই—ডুলি, ডুলি! কালাপোশ! (বাহির হইয়া গেল)

[আমিদ ছুটিয়া গিয়া মিল্লাতের হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া]

আমিদ—আসুন শাহজাদা, এই অবসর। (দ্রুত টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

[তোপ পড়িল]

নাজিব—(বলিতে বলিতে প্রবেশ করিতেছে) ওয়াজীর, চৌথ নয়, মারাঠা দিল্লী দখল করতে এসেছে। (এখনও প্রবেশ করে নাই)

শাহফানা—(মুখ তুলিয়া) হিন্দুপাদ পাদশাহী!

নাজিব—কেউ বলছে, শাহজাদী হজরত বেগমের নামে তারা দিল্লী দখল করবে। হজরত বেগমকে তারা পেলে কোথায়? (প্রবেশ করিল। সঙ্গে দুইজন কালাপোশ)

শাহফানা—সেই ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণ!

নাজিব—কোথায় উজীর? কই উজীর?

শাহফানা—নরিন্দর গিরির যাদু! এয়্ খোদা—

নাজিব—শাহফানা! উজীর কোথায়? শাহফানা!

শাহফানা—(প্রায় উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে সে একটু সচেতন হইয়া বলিল) আরে নাজিব খাঁ, আমাকে উত্যক্ত করিস না তুই।

নাজিব—উজীর কোথায়? (ক্রুদ্ধভাবে বলিল সে)

শাহফানা—পালিয়েছে সে। জানি না কোথায়।

নাজিব—তবে তোকেই আমি খুন করব ফকির।

[ফানা উন্মাদের মত হাসিতে লাগিল]

নাজিব—(শঙ্কিত স্বরে) ফকির!

ফানা—(হঠাৎ হাসি থামাইয়া) খুন করো নাজিব। কিন্তু সবুর—থোড়া সবুর। আর একবার দেখি। আর একবার দেখি।

[বসিয়া ছকে ঝুঁকিয়া পড়িল]

[ওদিকে তোপ পড়িল]

নাজিব—(চকিত হইল। তারপর কালাপোশদের বলিল) তোরা

ফকিরকে পাহারা দে। খবরদার! না পালায়! আবদালীর কাছে পাঠাব ওকে।

ফানা—তামাম আঁধিয়ারা! দিল্লী রোতি হ্যায়! (কপালে হাত দিলেন। হঠাৎ মুখ তুলিয়া কালাপোশকে বলিলেন) রিসালা, শুনতে পাচ্ছিস? (আবার বলিলেন) রিসালা!

কালাপোশ—ফকির সাহেব!

ফানা—কাদের তোপ পড়ছে? মারাঠার?

কালাপোশ—হাঁ ফকির।

ফানা—তু মুসলমিন?

কালাপোশ—লা ইলাহি ইল্লাল্লা। হাঁ হজরত।

ফানা—তবে কাঁদ্, রোদন কর্। সব রোশনি মুছে গেল, হিন্দোস্তানের বাদশাহী দরবার থেকে নবাব আমীর উমরাহ সওদাগর সব—সব মুসলিম দৌলতখানা থেকে রোশনি নিবে গেল! হিন্দুপাদ পাদশাহী! রোদন কর্ মুসলমিন রিসালা!

[নেপথ্যে নরিন্দর গিরির কণ্ঠস্বর]

নরিন্দর—শাহফানা! এ ভাই ফকির!

ফানা—কে? কে?

[নরিন্দর প্রবেশ করিল]

নরিন্দর—আনন্দ রহো ভাই—আনন্দ রহো!

[ফানা সভয়ে পিছাইয়া গেল]

ফানা—হিন্দুপাদ পাদশাহী? তুমি—তুমি নরিন্দর গিরি গোস্বামী!

কালাপোশ—জিন! যাদুবালে!

[কালাপোশেরা সভয়ে পিছাইয়া গেল]

নরিন্দর—ভয় নাই শাহফানা। আমি হিন্দুপাদ পাদশাহী নই, আমি এসেছি তোমার কাছে, জ্যোতিষ শুনে এ কি ভয়ঙ্কর খেলা খেলছ তুমি!

ফানা—হজরত বেটীর কাছে শুনেছি আমি—(আবার উন্মাদ হইয়া উঠিলেন) হজরত বেটী—আমার হজরত বেগম! নসীবের আঁধিয়ারার রোশনি! তুমি—তুমি তুলে দিয়েছ মারাঠা পেশবার হাতে। নরিন্দর গিরি—যাদুবালে! আমার হজরত বেটী!

[সে ঝাঁপ দিয়া পড়িল গিরির উপর]

ওরে রিসালা, ধর্ সয়তানকে! আমার হজরত!

নরিন্দর—ফানা, শাহফানা, আছে তোমার হজরত, আছে। (ঠেলিয়া দিলেন)

ফানা—আছে! আছে! মারাঠার কয়েদখানায় আছে!

নরিন্দর—না না—

ফানা—তুই—তুই তাকে মারাঠার হাতে তুলে দিয়েছিস। (আবার ঝাঁপাইয়া পড়িলেন)

নরিন্দর—ফানা! (বাধা দিলেন)

ফানা—হিন্দুপাদ পাদশাহী! তোর চোখ দুটো গেলে দোব আমি। দেখতে পাবি না—হিন্দুপাদ পাদশাহী।

নরিন্দর—আ—!

[কিন্তু কালাপোশ দুইজন তাঁহাকে ধরিল]

[চীৎকার করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন ফানাকে। কালোপোশ দুইজন সভয়ে ছাড়িয়া দিল। বলিল, জিন! যাদুবলে!

ফানা—(পড়িয়া গিয়া উঠিতে উঠিতে) আ—! তামাম হিন্দোস্তানে বাদশা নবাব আমীর উমরা সবার ঘরের রোশনি নিবে গেল! তুই কেড়ে নিয়েছিস—তুই।

[নরিন্দর উঠিয়া দাঁড়াইলেন কঠিন যন্ত্রণার মধ্যে। একটি চোখ হইতে রক্ত পড়িতেছে]

নরিন্দর—(যন্ত্রণার মধ্যে বলিলেন) একটা চোখ নষ্ট ক'রে দিলি ফানা! কিন্তু আমি তোর অনিষ্ট করতে আসি নি। এসেছিলাম তোর হজরত বেটীকে ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু—। আঃ, পাছে ভয় পাস্ তাই নিরস্ত্র এসেছিলাম! আঃ!—ফানা—!

ফানা—(সভয়ে পিছাইয়া গেল। কালাপোশেরাও গেল) নরিন্দর গিরি!

নরিন্দর—ভয় নেই ফানা। (কঠোর সংযমে আত্মসংবরণ করিলেন) শোধ আমি নেব না। আমার রুদ্র জাগে নাই। তুই পাগল। কিন্তু তুই পালা। পাগল, তুই পালা। আমার শিষ্যরা আসবে। তুই পালা।

ফানা—রিসালা, পালিয়ে আয়। পালিয়ে আয়। ওরে, ওরা চিমটে দিয়ে বিঁধে মারে। এই দিকে। সুড়ঙ্গ দিয়ে। এই দিকে।

[ভিতর দিকে চলিয়া গেল। কালাপোশেরা অনুসরণ করিল]

নরিন্দর—হে শঙ্কর! হে দয়াল! হে সুন্দর! আমার যন্ত্রণা মুছে দাও—হে মঙ্গলময়!

[চোখ চাপিয়া ধরিলেন]

নেপথ্যে শিষ্য—গুরু মহারাজ!

নেপথ্যে হজরত—গিরি মহারাজ! ফকির সাহেব!

নরিন্দর—(মাথা ঝাঁকি দিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন) বেটী হজরত, তুমি একা—একা চ'লে এস মা।

[তোপ পড়িল]

[নেপথ্য ধ্বনি উঠিল—বিজয়ী মারাঠার—হর-হর-মহাদেও! হর-হর-মহাদেও! হর-হর-মহাদেও! শিঙা বাজিল, নাকাড়া বাজিল]

[হজরত প্রবেশ করিল]

হজরত—ফকির সাহেব! গুরু! আমি পারব না, আমাকে মার্জনা কর তুমি। এ কি? গিরি মহারাজ! এ কি?

নরিন্দর—আস্তে মা, আমার শিষ্যরা শুনতে পাবে।

[বাজনা বাজিতে লাগিল। তোপ পড়িতে লাগিল]

[হজরত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

নরিন্দর—চল বেটী, কোথায় তোমায় পৌঁছে দিতে হবে চল।

[যবনিকা নামিয়া আসিল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাঞ্জাবে পশ্চিম-প্রান্তসীমায়—আহমদ শাহ আবদালীর ছাউনি—শিবিরের অভ্যন্তর।

মারাঠারা সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করার পর আবদালী প্রতিশোধ লইবার জন্য এবং হৃত মর্যাদা উদ্ধারের জন্য আবার ভারতবর্ষে অভিযান করিয়াছেন। পাঞ্জাবে ঢুকিয়া শিবির স্থাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে বৎসরাধিক কাল চলিয়া গিয়াছে। শিবিরের ভিতরে প্রশস্ত আসনে—চৌকীর মত আসনের উপর আবদালী বসিয়া আছেন। রাত্রিকাল। দুই পাশে দুইটি বাতিদানে বাতি জ্বলিতেছে। শাহ আবদালীর দুইটা কানই কাটা, নাক বসা, আফগানদের মত ছোট চোখ, ভুরু নাই, দাড়ি গোঁফ ক্ষীণ। আবদালীর পাশে একটি তরুণী ; গন্না বেগমের দলের মেয়ে। পাঞ্জাবের একটি গ্রামে গান গাহিবার সময় আফগানেরা লুঠ করিয়াছিল। সে এখন সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত। সে আবদালীকে সিরাজী ঢালিয়া দিতেছে। নর্তকীরা নাচে গানে তাঁহার মনোরঞ্জন করিতেছে। আবদালী গান শুনিতেছেন এবং ছোরা দিয়া নখ কাটিতেছেন।

নর্তকীদের গানের বিবতির ক্ষণে ঠিক তাল দেওয়ার মত দূরাগত হো—হো—হো—শব্দ শোনা গেল শেষের দিকে। আবদালী চমকিয়া উঠিলেন।

দূরাগত হো—হো—শব্দ শুনিয়া আবদালী চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উপরের দিকে আঙুল দেখাইয়া প্রশ্ন করিলেন, যেন নিজেকেই প্রশ্ন করিলেন—

আবদালী—ও কি ? ওই ? উয়ো আওয়াজ ? (উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সকলে সভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল)

আবদালী—(যেন কিসের আওয়াজ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন, এইভাবে বলিলেন) নেকড়া ! মাঝরাতে পাহাড়ের উপর নেকড়া ডাকছে ! (আগাইয়া গিয়া তাঁবুর জানালা খুলিয়া

শুনিলেন)—হাঁ, নেকড়া! (তারপর তরুণীটিকে বলিলেন) আরে লৌণ্ডি, তুই তো এই মুল্লুকের বেটী; নেকড়া না?

[তরুণী মানবাঈ—সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না, নেকড়া নয়]

আবদালী—মুখে বোল নাই তোর? নেকড়া না?

মান—না, জাঁহাপনা। নেকড়া না, মানুষ।

আবদালী—মানুষ?

মান—শিখ চাষী, পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে—গীত গাইছে।

আবদালী—গীত? না, গীত না। নেকড়ার ডাক। ভুখায় চীৎকার করছে। মাঝ রাতে নেকড়ারা এমনি ক'রে চিল্লায়। গীত! হাঃ! যারা পাহাড়ে জঙ্গলে ভয়ে লুকোলে, তারা গীত গাইতে পারে!

মান—ওরা ভয়ে লুকোয় নি জাঁহাপনা। ওরা ডাকু ব'নে গিয়েছে। লুঠেরা ওরা। ভয়ে না, লুঠ করবার জন্যে লুকিয়ে থাকে।

আবদালী—আঃ! আলা সিং—উয়ো আলা সিং—পাতিয়ালা! যে তৈমুরের কাছ থেকে লুঠের মাল কেড়ে নিয়েছিল? হাঁ—হাঁ।

মান—না, জাঁহাপনা। আলা সিং তো জমিদার ধনী সর্দার। ও না। এরা কিষাণ, মানজেরা শিখ আর চাষী জাঠ। জনাব, মারাঠাদের লাহোর দখলের সময় তাদের সঙ্গে জুটে আফগানদের তাঁবু লুঠতে লুঠতে গিয়েছিল, এরা তারা। আফগানদের কাছ থেকে লুঠ-করা খোরাসানী ঘোড়ার উপর চ'ড়ে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরছে। ঘর নাই, ক্ষেত নাই। ঘুরছে, লুঠছে, গীত গাইছে।

আবদালী—আ! সাদত খাঁ আফ্রিদী—সুবাদার খাওজা উবেদ খানকে এরাই মেরেছে? আমার তোপখানা এরাই লুঠেছে?

মান—হাঁ জাঁহাপনা। তারাই।

আবদালী—হাঁ। নেকড়া নেকড়া। শেরের পাশে পাশে ঘোরে, তার শিকার কেড়ে নেয়, কামড়ও মারে। ইয়ে থাবা—ইয়ে—(বাঁ হাতে থাবা তুলিয়া) মারব—চুর ক'রে দোব।

[বর্কআন্দাজ অর্থাৎ দ্বাররক্ষকের প্রবেশ]

বর্কন্দাজ—জাঁহাপনা! রোহিল্লা নবাব নাজিব খাঁ পল্টন নিয়ে এসে পৌঁছে গেলেন। তাঁবুর দরওয়াজায়—

আবদালী—(সোল্লাসে উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন) নাজিব খাঁ! আরে নাজিব! আ যা। ভিতর—ভিতর। আরে নাজিব!

[নাজিব প্রবেশ করিল—বর্কন্দাজ চলিয়া গেল, তরুণীও চলিয়া গেল]

নাজিব—বন্দেগী জাঁহাপনা!

আবদালী—আরে নাজিব, তোর জন্মে পঞ্জাবে ঢুকে আমি ব'সে আছি। এগোতে পারছি না! আগে খবর বল্। নতুন খবর।

নাজিব—ওয়াজির আমিদ—

আবদালী—জানি—জানি। কমবক্তের পেশা হ'ল বেইমানী। কাফির মারাঠাদের সঙ্গে সে যোগ দিয়েছে। কাফির মারাঠা তামাম হিন্দোস্তান থেকে বিলকুল আফগানদের চেনাব দরিয়া পার ক'রে দিয়েছে। শেরের বেটা শিয়ার—আবদালীর বেটা তয়মুর তোপখানা মালখানা ফেলে বাজপাখীর ভয়ে কউয়ার মত পালিয়েছে। আমিতুল মুল্ক আমার মেহমান মৈজু আলমগীর বাদশাকে ফিরুজসাহের দরগার ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছে। মিল্লাতকে শাহজান খেতাবে তখ্‌তে বসিয়েছে মারাঠার শল্লায়। সব জানি। হজরত বেগম কাফিরের কাবেদে—তাও জানি। অন্য খবর—নতুন খবর বল্। কাফিরের জঙ্গী-জোর কত তাই বল্। হিন্দোস্তানে ঢুকে আমি থমকে দাঁড়িয়ে আছি।

নাজিব—কাফির মারাঠা সত্তর হাজার ফৌজ নিয়ে হিন্দোস্তানের পঙ্গপালের মত ছড়িয়ে পড়েছে। পঞ্চাশ হাজার সওয়ার আর বিশ হাজার পয়দল।

আবদালী—আচ্ছা! আফগান—ত্রিশ হাজার সওয়ার—দশ হাজার পয়দল! তোর কত নাজিব?

নাজিব—দশ হাজার সওয়ার—বিশ হাজার পয়দল। আরও রোহিল্লা পাঠান নবাব হাফিজ রহমত বাঙ্গাশ—এরা তৈয়ার ক'রে রেখেছে আঠ হাজার সওয়ার—পয়দল দশ হাজার। মারাঠার ভয়ে তারা এখন চুপ ক'রে আছে। শাহ এগুলে ফাঁক পেলেই তারা যোগ দেবে।

আবদালী—জোড়্—কত হ'ল! আঠতাল্লিশ হাজার সওয়ার আর পয়দল চালিশ হাজার! কাফিরদের চেয়ে বেশী হ'ল?

নাজিব—হাঁ জাঁহাপনা।

আবদালী—এর পর ওউধিয়ার সুজা আছে, আর আর আমীরেরা আছে।

নাজিব—এদের কথা বলতে পারি না শাহানশাহ শাহ দুরানী। আমিহুল মুল্ক সোর তুলেছে—মুঘল-পাঠানী ঝগড়ার। বলে—পাঠানশাহী কায়েম হ'লে ইরানী তমদ্দুন একদম খতম হয়ে যাবে। বাবরশাহী বাদশাহী খতম হবে।

আবদালী—আর হিন্দুপাৎ পাদশাহী? আমি এদের এমন সাজা দেব নাজেব, যা জিন্দিগী ভোর ভুলতে পারবে না এরা। আগে কাফির মারাঠা। এবার আমি মারাঠার সঙ্গে হেস্তনেস্ত করব। আমি জানি এদের জোর। বহুৎ জোরদার। হয়তো দুটো পাহাড়ের ধাক্কায় দুই-ই চুর হয়ে যাবে। তবু দেখব। ওরা পারবে না আমার সঙ্গে। আমি জিতব। শাহনাদের

ব'লে গেছে, আমি হারব না। তার উপর হিন্দোস্তানী মানুষের স্বভাব আমার ভরসা। এরা কেউ কাউকে মানে না। কারু ভাল কেউ দেখতে পারে না। এবং সবাই রাজতখ্‌তে বসতে চায়; তার জন্যে খুন-খারাবি, বেইমানী করতে এদের বাধে না। এরা সবাই থুক্‌ দেয় সবারই গায়ে। এদের কাছে আমি হারব না। এরা বড়া ভারি গালিবাজ! আমি তোকে বলছি নাজেব, মারাঠাকে কেউ সাহায্য করবে না। দাঁড়িয়ে দেখবে, মনে মনে গালি দেবে কি—খতম হয়ে যাক, খতম হয়ে যাক,—আবদালী গেলে তখ্‌তে বসব আমি। আমি এদের কাছে হারব না।

নাজিব—এবার কিন্তু পেশবা খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করছে। ভারি কড়া হুকুম জারি করেছে।

আবদালী—হাঁ! তা হ'লে তো ভাবালি আমাকে। সে ব্রাহ্‌মণকে আমি দেখছি রে! গোকুল মহাবনে দু আদমীকে আমি দেখেছি। এক সন্ন্যাসী—সে শের। আর এক ব্রাহ্‌মণ খাড়া রইল এক জায়গায়—নড়ল না। তিন-তিন গুলি আমি ছুঁড়েছিলাম, গুলি পৌঁছল না। বাজপাখীর মত চোখ। শুনছি সেই পেশবা।

[নেপথ্যে পর পর তিন-চারিটি গুলির আওয়াজ হইল]

আবদালী—কি? কি হ'ল? আরে—এ বর্কঅন্দাজ!

[ছুটিয়া প্রবেশ করিল মানবাঈ]

মান—জাঁহাপনা! তারা। এ তারা। সেই তারা।

আবদালী—কারা? আঁ? কি বলছিস তুই?

মান—সেই জাঠ শিখ লুঠেরারা।

[বন্দুকের শব্দ ও হো—হো—হো—হো—হো—হো—সঙ্গীতাত্মক ধ্বনি]

নেপথ্যে—হুঁশিয়ার, লুঠেরা—ডাকু!

আবদালী—আ! নেকড়া—নেকড়া!

[জেহান খাঁর প্রবেশ]

জেহান—একদল জাঠ আর শিখ লুঠেরা, জাঁহাপনা, ত্রিশটা ঘোড়া আর বন্ধুক লুঠে নিয়ে গেল।

আবদালী—কি? ছাউনিতে নয় জাঁহাপনা। ছাউনি থেকে খানিকটা দুর। একদল সিপাহী সন্ধ্যের পর লুকিয়ে বেরিয়েছিল প'ড়ো গাঁওগুলি খুঁজতে। আমাদের ভয়ে যারা গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে, তারা যদি রাত্রে ফিরে এসে থাকে।

আবদালী—হাঁ হাঁ, আওরতের জন্যে বেরিয়েছিল।

জেহান—কয়েকজনকে পেয়েছিল তারা। তাদের বেঁধে নিয়ে আসছিল। পথে পাহাড় থেকে নেমে এল ডাকুর দল।

আবদালী—নেকড়া—নেকড়া!

জেহান—জাঁহাপনা!

আবদালী—নেকড়া। একটু আগে ওরাই চিল্লাচ্ছিল—হো—হো—হো—হো-হো-হো। নেকড়ারা বিলকুল পাঠানের দলটাকে ছিঁড়ে দিয়েছে? একটা নেকড়াও ধরা পড়ে নি?

জেহান—না জাঁহাপনা। বাঁধা আদমীদের খালাস ক'রে নিয়ে ঘোড়া-বন্দুক লুঠে পালিয়েছে। ওদের তিন-চারজন জখম হয়েছিল, তাদের মুণ্ডু কেটে নিয়ে গিয়েছে।

আবদালী—(জানালায় গিয়া) জেহান খাঁ, জলদি যাও, একেবারে শেষ এলাকায় তাঁবুতে আগুন লাগাও, আমি দেখব। জলদি। আর, যে কুত্তারা হুকুম না মেনে রাতে বেরিয়েছিল, তাদের সবচেয়ে জবরদস্ত লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

[জেহান খাঁর প্রস্থান]

আবদালী—নাজেব খাঁ! এই ডাকুর দল—নেকড়ারা মারাঠাদের হুকুম মানে?

নাজিব—জাঁহাপনা, ওরা মারাঠাদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল; কিন্তু মারাঠারা নেয় নি। তার উপর এখন, জাঁহাপনা, লুঠের মাল নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। ঘোড়া আর বন্দুক—এ ওরা দিতে চায় না। মারাঠার দাবি—সব চাই। মারাঠারা ওদের ডাকু ব'লে নাকাড়া দিয়েছে।

আবদালী— আচ্ছা! আচ্ছা! আচ্ছা!

[নেপথ্য হইতে গান ভাসিয়া আসিয়া আসিল—
"জ্বালা জ্বালা—রোশনি জ্বালা, জ্বালা রোশনি
হো—হো—হো, হো—হো—হো]

আবদালী—এ লৌণ্ডি! কি গীত গাইছে ওরা? জানিস তুই?

মান—জানি জনাব।

আবদালী—গা সে গীত।

মান—শাহনশাহ রাগ করবেন না? গাইব?

আবদালী—রাগ হ'লে রাগ করব। না গাইলেও রাগ করব। টুঁটি কেটে ফেলে দেব ময়দানে, রাতে শিয়ারে খেয়ে ফেলবে। নে—শুনা গীত।

[মানবাঈ গীত• গাহিল]

আবদালী—এ গীত তৈরি করেছে কে? কার কাছে শিখেছিস?

মান—সে জাঁহাপনা, এক দেওয়ানা লেড়কী। হয়তো বা কোন আমীর-উমরা কি বাদশার বেটী হবে।

আবদালী—হাঁ! কি নাম তার? হজরত?

মান—না, জাঁহাপনা, রট্টা। রট্টা তার নাম। শাহ আবদালী, আপনি তিন বছর আগে মথরা লুঠ করেন, তার পরেই এই

দেওয়ানা কোথা থেকে এল—এই গীত গাইতে গাইতে। আমি, জাঁহাপনা, গরীব জাঠের মেয়ে—মথরা লুঠের সময় বাপ মরেছিল লড়াইয়ে, মা মরেছিল যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে, আমার উপর পাঠান সিপাহী জবরদস্তি করলে, আমি বেহোঁশ হয়ে পড়েছিলাম, তারপর ভিখ্ মেগে বেড়াতাম। সেই দেওয়ানা রট্টা ডেকে নিলে। গীত শেখালে। তারই কাছে শিখেছিলাম গীত।

নাজিব—হাঁ জাঁহাপনা। ও ঠিক বলছে। সে এক অদ্ভুত মেয়ে।

আবদালী—আচ্ছা, কিন্তু পঞ্জাবে এলি কি ক'রে তুই? জেহান খাঁ তো তোকে পঞ্জাবে লুঠ করেছে। মথরা তো এখান থেকে অনেক দুর।

মান—আজ তিন বরষ, জাঁহাপনা, দেওয়ানা মথরা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত গাঁওয়ে গাঁওয়ে ঘুরেছে। গীত গেয়েছে। তারই সঙ্গে আমি এসেছিলাম পঞ্জাব। তার ডর নাই, তার মহব্বত নাই, শুধু এই গান। নিজে তৈরি করে গান। পঞ্জাবে মানজাহা শিখেদের গাঁওয়ে একদিন গান গাইছিলাম তার সঙ্গে—আফগান ফৌজ এসে পড়ল। তাকে ধরা যায় না—সে ধরা পড়ল না, আমি ধরা পড়লাম।

আবদালী—হাঁ! তার জন্মে তোর দুঃখ নাই? সব বলবি লৌণ্ডি।

বাহির হইতে কণ্ঠস্বর—জাঁহাপনা, তাঁবু জ্বলেছে।

[আবদালী ছুটিয়া তাঁবুর জানালায় গেলেন]

আবদালী—হা—। ওই—ওই—

[ছুটিয়া নিজের বন্দুক লইয়া জানালা দিয়া গুলি করিলেন]

আ—হাঃ। বহুৎ দুর চলা গিয়া। (ফিরিয়া আসিলেন) হাঁ, বোল্ লৌণ্ডি।

মান—না জাঁহাপনা, দুঃখ নাই।

আবদালী—ঝুট। ঝুট বলছিস তুই।

মান—না, না, আমাকে মারবেন না শাহনশাহ। আমি বড় গরীবের মেয়ে। এত ভাল কখনও খাই নি, এমন পোশাক কখনও পরি নি, এত আরাম—

আবদালী—কি জাতের মেয়ে তুই? কাফির?

মান—দাদা ছিল হিন্দু, বাপ হয়েছিল মুসলমান। মা মুসলমান হয় নি, আমাকে নিয়ে ভিক্ষে ক রে বেড়াত। আমরা বড় গরীব শাহেনশা।

আবদালী—গরীব! আচ্ছা।

[জেহান খাঁ একজন সৈনিককে লইয়া প্রবেশ করিলেন]

[মুহূর্তে আবদালী আগাইয়া আসিলেন]

এই? এই জেহান খাঁ?

জেহান—হাঁ জাঁহাপনা।

আবদালী—এ কুত্তা!

সৈনিক—(সকাতরে) জাঁহাপনা—

আবদালী—(আরও রূঢ়ভাবে) এ কুত্তা! আওরতের গোস্ত, দৌলতের হাড্ডির গন্ধে কবরখানা খুঁড়তে গিয়েছিলি? হুকুম মানিস নি?

সৈনিক—(আরও সকাতরে) জাঁহাপনা—

[ছুটিয়া গিয়া আসনের পাশে রাখা তূণীর হইতে তীর লইয়া আসিয়া তাহার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া চুলে ধরিলেন]

সৈনিক—মেহেরবান! শাহনশাহ!

আবদালী—হাঁ—হাঁ। (তীর দিয়া নাক ছেঁদা করিয়া দিলেন) আচ্ছা। জেহান খাঁ, যত সিপাহী গিয়েছিল, তাদের সবার নাক এমনি

ক'রে ছেঁদা ক'রে দাও। তারপর লম্বা ডুরিতে সকলকে ওই নাকের ছেঁদায় বেঁধে তামাম দিন ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও। যাও।

[সিপাহীকে লাথি মারিলেন]

জেহান—যো হুকুম শাহনশাহ।

[জেহান সৈনিককে লইয়া চলিয়া গেলেন]

আবদালী—এরে গরীবকে বেটী!

মান—মেহেরবান বাদশাহ!

আবদালী—তুই সেই দেওয়ানাকে চিনিয়ে দিতে পারবি?

মান—দেখতে পেলে পারব শাহেনশা। কিন্তু—

আবদালী—আরে, দুনিয়া ঢুঁরে তাকে বার করব আমি। মথরা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত গীত গেয়ে সে আগুন জ্বালালে। নাজিব খাঁ, এই আগুন নিয়ে মশাল জ্বালতে নারাজ হ'ল পেশবা? নাজিব, পেশবকে একখানা চিঠি লেখ্।

নাজিব—পেশবাকে চিঠি?

আবদালী—হাঁ। লেখ্ চিঠি। তোর নাম দিয়ে লেখ্। লেখ্—দুরি-দুরানী আবদালী এই কালের রুস্তম—তাঁর কথা তোমাকে জানাচ্ছি পেশবা। আমার কথা নয়, তাঁর কথা। লেখ—দুরি দুরানী তোমাকে গোকুল মহাবনে দেখেছে পেশবা। তুমি দুনিয়ায় বাঁচবার মত মানুষ। তোমার চোখ দুটো আচ্ছা চোখ। ঠিক পাহাড়িয়া বাজপাখীর মত। আকাশে উড়তে উড়তে অনেক দূর দেখ তুমি। কিন্তু আকাশ থেকে দেখ ব'লে সব জিনিসকে ঠিক আন্দাজ করতে পার না। নইলে শাহ আবদালীর সঙ্গে লড়াই করতে তুমি ভাবতে। সে শের। তার থাবায় বড় বড় কেল্লা চুরমার হয়ে যায়। তার নসীবে খোদাতয়লা হার

লেখে নাই। সে কখনও হারবে না। সব কালের রুস্তম শাহ নাদের ব'লে গিয়েছে—সে কখনও হারবে না। তবু আবদালী তোমার সঙ্গে লড়াই চায় না। তুমি তার সঙ্গে লড়াই ক'রো না। সে বেশী কিছু চায় না। তার দাবি পঞ্জাব মুল্লুক, আর শাহজাদী হজরত বেগম।

নাজিব—জাঁহাপনা, হজরত বেগম—

আবদালী—সবুর। পরে শুনব। আগে চিঠির কথা শেষ হোক। হাঁ, লেখ্, এই দুই হ'লেই আবদালী ফিরে যাবে কান্দাহার। লড়াইয়ে তুমি হারবে। আবদালী তোমাকে বলছে—হিন্দোস্তানের মানুষ ভারি খারাব। তোমাকে কেউ সাহায্য করবে না। তোমার হার দেখে খুশী হবে। হারলে গায়ে থুক দেবে। পঞ্জাব আর হজরত বেগম—এই দুই শাহকে দাও। বাকি হিন্দোস্তানে বাদশাহী নিয়ে তুমি যেমন খুশী খেলা কর। পঞ্জাব আর হজরত বেগম। ব্যস্। এই লিখে চিঠি এক হিন্দুকে দিয়ে পাঠিয়ে দে পেশবার কাছে। এইবার বল্—হজরত বেগমের খবর।

নাজিব—শাহফানাকে আমি বন্দী ক'রে এনেছি। সে-ই হজরত বেগমকে মহল থেকে বের ক'রে নিরুদ্দেশ করিয়েছিল।

আবদালী—শাহফানা! নিয়ে আয় তাকে।

নাজিব—সিপাহী! শাহফানা।

আবদালী—তোর সে চিঠি আমি পেয়েছি। ফানা—ফানা—হজরতকে গায়েব করেছিল। নসীব গুনে সে হজরত বেগমকে তখতে বসিয়ে বাবরশাহীর ইজ্জত ফেরাবে। তার সাজা আমি ঠিক ক'রে রেখেছি।

[সিপাহীর সঙ্গে শাহফানার প্রবেশ]

আবদালী—আ! শাহ্‌ফানা! নসীব-পড়নেবালে শাহ্‌ফানা!

ফানা—(নির্ভয়ে) আবদালী!

আবদালী—আ! ওই চোখে তুমি নসীবের অন্ধকারে রোশনি খুঁজে বার কর। না? (হাসিয়া উঠিল)

ফানা—(কয়েক মুহূর্ত কুঞ্চিত ললাটে তীক্ষ্ণচক্ষে আবদালীকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল)—সে চোখ দুটোর রোশনি নিবিয়ে দেবে তুমি?

আবদালী—ফানা!

ফানা—তোমার মনের কথা আমি এখনও পড়তে পারছি আবদালী। অধরমীর হাতে যাবে আমার চোখ। আমি ভেবেছিলাম, সে অধরমী নরিন্দর! ভাবি নাই—তুমিই সে অধরমী।

আবদালী—আ! আমি অধরমী! সিপাহী! দে—দে—দে, ওর চোখ দুটো গেলে দে।

ফানা—দে। কিন্তু একটা কথা। জলদি এগিয়ে যাও। জলদি। হজরত দিল্লীর হারেমে। তাকে তুমি উদ্ধার কর আবদালী। মহিউল মিল্লাতের হারেমে ব'সে মালা গাঁথছে। চম্পা ফুলের মত গায়ের রঙ, পদ্মের পাপড়ির মত চোখ যার, তার স্বপ্নে সে মশগুল। বাদশাহীর পচা রক্ত। ফকিরী ভেসে গেল। তাকে উদ্ধার কর আবদালী। ওদের দুজনের নসীব এক হ'লে রুখতে পারবে না। হিন্দুপাদ পাদশাহী, হিন্দুপাদ পাদশাহী! তুমি বাঁচাও। তুই অধরমী আবদালী, তবু—তবু—

আবদালী—(চীৎকার করিয়া উঠিল) আঃ!

[সিপাহী তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। ফানা উন্মাদের মত হাসিতে হাসিতে গেল]

আবদালী—নাজির খাঁ!

নাজির—জাঁহাপনা।

আবদালী—উঠাও ছাউনি। তরাইয়ের পথে রোহিলখণ্ড। দিল্লীতে হজরত বেগম।

[আসনের পাশে রাখা শিঙ্গা তুলিয়া ফুঁ দিলেন]

কিন্তু হুঁশিয়ার! নেকড়াকে হুঁশিয়ার। চারিপাশে নেকড়া। হুঁশিয়ারি ক'রে নেকড়ার হাত থেকে বেঁচে চল; খবরদার —ওদের মারতে যেয়ো না। মেরো না। মার খেলে মারাঠার সঙ্গে মিশে যাবে। শুধু নজর রাখো—কোন গীত-গাহনেওয়ালী যদি ওদের সঙ্গে থাকে, তবে তাকে পাকড়াও। এ লৌণ্ডি, সে দেওয়ানাকে তোকে চিনিয়ে দিতে হবে। আমি দেখব তাকে। গীত-গাহনেওয়ালী, আগুন-জ্বালানে-বালীকে দেখব আমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উত্তর-ভারতের গ্রামাঞ্চল

গ্রাম্যপথের ধারে একটি গাছতলা। গন্নার সঙ্গিনী দুইটি মেয়ে গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

দৃশ্যারম্ভের সূচনায় গন্নার নেপথ্য কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আ-যামি-ই গন্না বেগম! অভাগিনী গন্নার কবর, মুসাফের, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে যাও।"

সঙ্গিনী—দেওয়ানা হয়ে গেল। শেষ দেওয়ানা হয়ে গেল রত্নাদিদি। গীত-গাহনেবালী আগ-জ্বলানেবালী রত্নাবাঈ দেওয়ানা হয়ে গেল।

সঙ্গিনী—বরাবরই ও দেওয়ানা বহেন। আমার মন বরাবর বলেছে।

সঙ্গিনী—ঘুঙুর ওড়নার কবর দিচ্ছে। মথরা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত বুকের জ্বালায় আগুন-জ্বালানো গীত গেয়ে এল যে মেয়ে, সে মেয়ের চোখে দরিয়া ব'য়ে গেল! হা-রে-হা!

সঙ্গিনী—কবরে লিখলে আ-মা-মি-ই গন্না বেগম। গন্নার জন্যে কাঁদ—
গন্না কে?

[গন্নার গান শোনা গেল। গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল—
ঝরা গোলাপের দলে—চাঁদ কেঁদে যায় রাতে—
মোর সমাধিতে প্রিয় তুমি কেঁদো তারই সাথে]

[গান দুই কলি গাহিয়াই সে বিষণ্ণ বিচিত্র হাসি হাসিয়া আপনার কপালে হাত দিয়া সঙ্গিনীদের বলিল]

গন্না—ঝুট। সব ঝুট বহেন, দুনিয়ার সব ঝুট। গুলাবই ঝ'রে যায় চিরদিন, চাঁদ কোনদিন কাঁদে না! শিশিরের ফোঁটা, ওই চোখে নিমকের গুঁড়া দিয়ে তয়ফাওয়ালীর চোখের ঝুটা পানি।

সঙ্গিনী—তুমি কি শেষ দেওয়ান হয়ে গেলে রট্টাদিদি?

গন্না—(মুখের দিকে তাকাইল। অতর্কিতভাবে সে ধরা পড়িয়া মুহূর্তে সচেতন হইয়া উঠিল) কি? কি বললি? আমি দেও-য়ানা হয়ে গেলাম? (এবার হাসিয়া উঠিল, হাসিয়া ঢাকা দিতে চেষ্টা করিল)

সঙ্গিনী—রট্টাদিদি, এমন ক'রে তুমি হেসো না।

গন্না—কেন? ভয় করছে? না রে না, আমি দেওয়ানা হই নি, মগজ আমার ঠিক আছে।

সঙ্গিনী—তবে তুমি ওসব কি করলে? মানুষ নাই—তুমি কবর দিলে কার?

গন্না—ও! সেই জন্যে ভয় লেগেছে তোদের! ও আমার এক সখীর কবর দিলাম বহেন। সে কুইয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছে, তার রেশমী ওড়না, রূপার ঘুঙুর আমার কাছে ছিল। তাই দিয়ে সেই সখীর কবর দিলাম। তার গতি হওয়া চাই তো ভাই, এতদিন ভুলেই ছিলাম। এখন সে রোজ রাত্রে স্বপ্নে দেখা দেয়, বলে—সখি, আমায় কবর দাও। আমার শান্তি হোক।

সঙ্গিনী—তার নাম বুঝি গন্না ?

গন্না—কি ক'রে জানলি তুই ? (চমকিয়া উঠিল)

সঙ্গিনী—তুমি যে লিখলে—অভাগিনী গন্নার জন্তে, মুসাফের, এক ফোঁটা জল ফেলে যাও

গন্না—হাঁ হাঁ বহেন। তার নাম গন্না। বড় অভাগিনী রে ! বাপ ছিল বড়া ভারী—সায়ের্ বিখ্যাত কবি কুইলি খাঁ। মা-ও ছিল যমনাবাঈ—সেও ছিল সায়ের—কবি। কিন্তু সে ছিল তয়ফা-ওয়ালী। নাচে-গানে তার জুড়ি ছিল না। রূপেরও তুলনা ছিল না। দুজনে ঘর বেঁধেছিল ; মোল্লা কি ব্রাহ্মণ ডেকে সাদি করে নি। তাদেরই মেয়ে গন্না। তারও ছিল গুলাবের মত সুরত, সেও ছিল বাপ-মায়ের মত সায়ের—গীত রচনা করত। নাচে গানে সুরতের খ্যাতিতে শহর দিল্লী শহর লক্ষ্ণৌ পাগল হয়ে গিয়েছিল। আমীরেব ছেলেরা তাকে আপনার করবার জন্তে সোনা-রূপা-জহরত ঢেলে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাপ-মা বলেছিল—মহব্বতি সাচ্চা না হ'লে কারুর গলায় মালা যেন দিস নে বেটী। তুই হিন্দু না, মুসলমান না, তোর জাত নাই। তুই মানুষ, তুই কবি।

সঙ্গিনী—তারপর ? মহব্বতি না পেয়ে কুঁইয়ায় ঝাঁপ দিলে ?

গন্না—না। আবদালীর ভয়ে। আবদালী বললে—নিয়ে আয় ওই বেসরমী তয়ফাবালীর বেটী তয়ফাবালীকে, বন্দীকে দিয়ে দেব আমার ঝাড়ুদারের হাতে। বাদশাহী সিপাহীরা তার ঘর লুঠলে। মা তাকে নিয়ে পালাল। পথে মাকে খুন করলে—সয়তানের মত বদমাস সিপাহীরা। গন্না লাফিয়ে পড়ল এক কুঁইয়ায়।

সঙ্গিনী—হায়—হায়—হায় !

গন্না—সেই কুঁইয়াতে আমিও পড়েছিলাম। গন্না ম'রে গেল।

সঙ্গিনী—তুমিও কুঁইয়ায় লাফিয়ে পড়েছিলে ?

গন্না—পড়েছিলাম। কিন্তু নসীব বহেন। আমাকে বাঁচালে এক দেহাতি চাষীর ছেলে।

সঙ্গিনী—সেই বুঝি তোমাকে এ দেশে এনেছে ?

গন্না—মরণ আমার। আমি তখন বুকের জ্বালায় আর দেহের যন্ত্রণায় চীৎকার করছি, ঠিক ঠিক হোঁশ ছিল না। থাকলে চাষীর ছেলেকে খুন করতাম, কেন সে আমাকে বাঁচালে ? হুঁশ যখন ফিরল, সে তখন আমাকে দুই আমীরের জিম্মায় রেখে পালিয়েছে। আর মরতে ইচ্ছে হ'ল না। ইচ্ছে হ'ল, বুকের জ্বালায় দেশে দেশে আগুন জ্বালিয়ে বেড়াই। সেই গন্নার কবর দিলাম। সেই বলেছিল মরণের সময়—আমার ঘুঙ্গুর-ওড়না নিয়ে কবর দিয়ো আর লিখে দিয়ো—'মুসফের, গন্নার জন্যে এক ফোঁটা জল ফেলে যাও। সে বড় অভাগিনী।'

সঙ্গিনী—হায় গন্না বেগম !

গন্না—থাক্ তার কথা। ভুখ লেগেছে। যা তো খানিকটা দূরে আছে সরাইখানা। কিছু সত্তু কিনে আন্। আর জল। দুজনেই যা।

[দুইজনেই চলিয়া গেল। গন্না আবার সেই গানটি গাহিল—পুরা গাহিল এবার। চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রতনবাঈ]

রতন—হে মথরানাথ, হে সুরুয নারায়ণ, তুমি বিচার ক'রো দেওতা, তুমি বিচার ক'রো। মেরে বেটা—মেরে জবাহিরলাল—তোমার সিপাহী সে, তার উপর এমন জুলুম তুমি বরদাস্ত করছ কি ক'রে ? (সে গন্নাকে লক্ষ্য না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল)

গন্না—মাতাজী! মাতাজী! (সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

রতন—বেটা? হাঁ, আমার বেটা—আমার জবাহিরলাল—আমার দুলাল—

গন্না—কি হয়েছে মাতাজী?

রতন—মারাঠা ফৌজদার কয়েদ করেছে তাকে। নাকি এমন ক'রে মেরেছে রে, যে, পিঠখানা চষা-ক্ষেতির মত ফালি ফালি হয়ে গেছে! মাথাতে মেরেছে, বেটী, তলোয়ারের উল্টা পিঠ দিয়ে—মাথা ফেটে গেছে;—বেহুঁশ হয়ে গেছে।

গন্না—কেন মাতাজী? কি কসুর তার?

রতন—আরে বেটী, রাজা যে, তার কাছে কসুরের দরকার কি? তার হুকুম না মানলেই সে মারবে। আরে বেটী, এ তো সেই বর্গীরা রে, যারা ঘর জ্বালিয়ে, নাক কান কেটে চৌথ আদায় করত। আজ আবার তারা বাদশা হতে চলেছে। হুকুম দিয়েছে—ঘোড়া, বন্দুক যা জাঠেরা রোহিলাদের মুলুক লুঠে নিয়ে এসেছে তা সব দিতে হবে। খোরাসানী ঘোড়া —হাতিয়ার। একে জাঠ, তায় জবাহির পাগল, সে বলেছে—নেহি দুঙ্গা। ব'লে পেশোয়া তাকে যে তলোয়ার ইনাম দিয়েছিল, সেই তলোয়ার ফেলে দিয়ে বলেছিল—আমি চাই না, এ ইনাম নিয়ে যাও। ফেরত দিলাম আমি। গাঁও ঘেরাও ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়েছে তাকে। কে—কে এর বিচার করবে? হে মথুরানাথ! তাই—তাই আমি যাচ্ছি। ফৌজদার আমাকে খুন করুক, নয় আমি খুন করব।

[সে ছোরা বাহির করিল]

এ আমার স্বামী রঘু জাঠের ছোরা। (সে চলিয়া গেল)

গন্না—হা-রে হা! হা-রে হা!

[অন্য দিক হইতে ছুটিয়া প্রবেশ করিল মেয়ে দুইটি]

সঙ্গিনী—দিদি! রট্টাদিদি! বর্গী সিপাহীরা ছাউনি ফেলেছে।

গন্না—হে ভগবান, জুলুমবাজদের বরবাদ কর তুমি। অত্যাচারীদের ধ্বংস কর।

সঙ্গিনী—চুপ কর দিদি, শুনতে পেলে হয়তো জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেবে।

গন্না—(হাসিয়া উঠিল) আগুনে ফেলে দেবে?

[সে গাহিয়া উঠিল—]

ব্যথা আমার বুকের মাঝে আগুন হয়ে
জ্বলছে—জ্বলছে—অগ্নিজ্বালায়।

[হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মধ্যপথে থামিয়া গেল]

[টলিতে টলিতে জবাহির আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কপাল বাহিয়া রক্তের ধারা গড়াইতেছে]

জবাহির—(স্বপ্নাচ্ছন্নের মত গাহিল। তাহার যেন যন্ত্রণাবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে সে যেন বিকারগ্রস্ত)—হো-হো-হো! হো-হো-হো! হো-হো-হো!

গন্না—সর্দারজী! জবাহির সিংজী!—মাতাজী! মাতাজী!

জবাহির—হো-হো-হো! (সে উপুড় হইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

গন্না—সর্দার! সর্দার জবাহির সিং! এ কি, বেহুঁশ হয়ে গেছে! বহেন, জল জল।

[সঙ্গিনী জল লইয়া ছুটিয়া আসিল—জবাহিরের মুখে জল দিল]

একজন ছুটে যা। মাতাজীকে ফিরিয়ে নিয়ে আয় জলদি।

[একজন ছুটিয়া চলিয়া গেল]

সর্দার! আঃ, ভগবান! হে মথরানাথ, দয়া কর! হে খোদা, মেহেরবানি কর!

সঙ্গিনী—দিদি, সর্দার চোখ মেলেছে। দিদি!

গন্না—সর্দার! সর্দার জবাহির সিং! সর্দার, এমন ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন? সর্দার!

[জবাহির সবলে উঠিয়া বসিল]

গন্না—না না। এমন ক'রে উঠো না।

জবাহির—তুমি সেই, তুমি সেই, তুমি সেই। চিনেছি তোমাকে আমি। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) কেন তুমি ঝুট বলেছিলে আমাকে?

গন্না—সর্দার! কি বলছ? কি ঝুট বলেছি?

জবাহির—হাতে সেই কাঁকনি। তুমি সেই। কেন তুমি আমাকে বলেছিলে—তুমি নও? তুমি সেই—আঁধার রাতে দেখেছিলাম তোমাকে—রাধারাণীর মত সুরত—

গন্না—না সর্দার, সে হজরত বেগম—

জবাহির—হাঁ হাঁ। তাকে বাঁচিয়েছিলাম পানসী থেকে। পেশবার দরবারে তাকে দেখেছি। সে নয়। ভুল হয়েছিল আমার। আবার সব মনে পড়েছে। আঁধিয়ার দিল্লীতে থমথম করছে সব, আবদালী আসছে। কুঁইয়ার ভিতর থেকে উঠছিল কান্না। আঃ, সে কি কান্না!

গন্না—সর্দার! (সবিস্ময়ে তাহাকে যেন প্রশ্ন করিল) সে—সে—?

জবাহির—হাঁ হাঁ, সে তুমি। সে তুমি। সে কান্নার সুর এখনও কানে লেগে রয়েছে আমার। আমি কুঁইয়ায় নেমে তুললাম; আঁধিয়ারায় যেন গুলাব ফুটে উঠল। কিন্তু চাষার ছেলে আমি, সে গুলাব কোথায় রাখব? ভয় হ'ল। তুই আমীরকে

ডেকে বললাম—জনাব, কোন হীরামতির ফুলদানির গুলাব খ'সে মাটিতে পড়েছে। একে সেই ফুলদানিতে তোমরা রেখে দিয়ো।

গন্না—সর্দার, সে তুমি? (চীৎকার করিয়া বলিল)

[জবাহির ক্লান্তভাবে আবার শুইয়া পড়িল—হে ভগবান!]

গন্না—সর্দার! সর্দার!

[জবাহির উত্তর দিল না—গন্না আবার মুখে জল দিল]

[নরিন্দর গিরি ও একজন শিষ্যের প্রবেশ]

নরিন্দর—এই পত্র পেশবার হাতে দিয়ে তার উত্তর নিয়ে আসবে তুমি। বলবে—

গন্না—গিরি মহারাজ! সর্দার জবাহিরকে দেখুন। একবার তাকে আপনি বাঁচিয়েছেন। দেখুন আবার তার দশা।

নরিন্দর—রট্টাবাঈ? জানি মা, সব জানি। এই যে! আমি না গিয়ে পড়লে কি হ'ত জানি না। আমিই জবাহিরকে মুক্ত ক'রে এনেছি। সরাইখানায় আমি চিঠি লিখতে বসেছিলাম, পাগল তারই মধ্যে উঠে চ'লে এসেছে। নিষ্ঠুর অত্যাচার! ওঃ! হায় পেশবা! হায় পণ্ডিত!

গন্না—হে ঈশ্বর, তুমি কি নাই? এর বিচার করবে না তুমি?

জবাহির—(ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়াছিল, বলিল) সেদিন তুমি আরও বলেছিলে—আকাশ থেকে বিজলী হানো অত্যাচারীর মাথায়। ধ্বংস করো মুঘল বাদশাহী বংশকে।

গন্না—তুমি? তুমি সেই? মেরে সর্দার, তুমি সেই?

জবাহির—(তাহার হাতের কঙ্কণ নাড়িয়া) এই সেই কাঁকনি। এই সেই কাঁকনি।

[নেপথ্যে মারাঠার শিঙা বাজিল]

ঘোষণা—আগে বাঢ়ো মারাঠা পল্টন, আগে বাঢ়ো। আবদালী আফগান পাঞ্জাব থেকে তরাইয়ের পথে—রোহিলখণ্ডে ঢুকেছে। আগে বাঢ়ো। রোহিলখণ্ডে—

[জবাহির উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল, গন্না তাহাকে ধরিল]

নরিন্দর—(শিষ্যকে) আমি চললাম পেশবার কাছে। মহিন্দর গিরিকে ব'লো আমার আদেশ রইল—আফগান হোক, মারাঠা হোক,—এদের উপর যারা অত্যাচার করবে তাদের রোধ করবে গোস্বামী সন্ন্যাসী।

[প্রস্থান]

[নেপথ্যে নাকাড়া বাজিতে লাগিল]

জবাহির—রট্টা! মেরে রাধা!

গন্না—মেরে সর্দার। মেরে রুস্তম!

[রতনবাঈ ছুটিয়া আসিল]

রতন—বেটা!

জবাহির—মা! মা!

রতন—চল্ বেটা, পাহাড়ে বনে চল্। ঘরে না—ঘরে না। ওরা বাঁচতে দেবে না ঘরে।

জবাহির—রট্টা! মা! রট্টা মেরে রাধা।

গন্না—আয় বহেন আয়।

[সকলে চলিয়া গেল]

নেপথ্যে—রোহিলখণ্ড! রোহিলখণ্ড!

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী মহলের দেহড়ি সলাতিন।

[প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান-সংস্থান]

দৃশ্যারম্ভের সূত্রে মিল্লাতের কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইবে—হজরত!

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—হজরত দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে একটা সাপের কঙ্কাল ঝুলিয়া আছে। হজরত একখানা খসিয়া-পড়া ইট টানিয়া বাহির করিয়া ধরিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সাপের কঙ্কালটা নিচে পড়িয়া গেল।

নেঃ মিল্লাত—হজরত! (দ্বিতীয় বার)

হজরত—(ইট হইতে মুখ তুলিয়া) জাঁহাপনা!

[মিল্লাত প্রবেশ করিলেন]

মিল্লাত—একটা আনন্দ সংবাদ এনেছি মা।

হজরত—বলুন বা'জান। আমিও আপনাকে একটা বিচিত্র জিনিস দেখাব। (ইটখানি সেই দেওয়ালেই রাখিল)

[মিল্লাত কাছে আসিলেন]

মিল্লাত—কুঞ্জপুরার যুদ্ধে আফগানদের প্রচণ্ড পরাজয় ঘটেছে। দুরানী সুবাদার নবাব আবদাস সামাদ, রোহিল্লা নবাব মিয়া কুতব খাঁ—দশ হাজার ফৌজ নিয়ে শেষ হয়ে গেছে। আবদালী রোহিল্লাদের এলাকার অনুপ শহরে ব'সে ভাবছে—হিমালয়ের কোলে কোলে তরাইয়ের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে আফগানিস্তানে ফিরবে কি না! কিন্তু তাতেও ভয় হচ্ছে। পাঞ্জাব থেকে জম্মু পর্যন্ত পাহাড়ে জঙ্গলে দলে দলে ক্ষ্যাপা নেকড়া ঘুরছে—উৎখাত শিখের দল। তারা হয়তো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে।

হজরত—খোদা মেহেরবান! বাঁদী, বসবার আসন দে।

বাঁদী আসিয়া দুইটি আসন দিল—মিল্লাত বসিলেন, হজরত বসিল না]

মিল্লাত—খোদা মেহেরবান হজরত। এইটেই কিন্তু আমার আনন্দ সংবাদ নয়।

হজরত—বা'জান, আফগান আবদালী কি মার্জনা ভিক্ষা ক'রে খত পাঠিয়েছে ?

মিল্লাত—না বেটী, মারাঠা পেশবার প্রতিনিধি কুমার বিশ্বাস রাও কুঞ্জ-পুরার লড়াই ফতে ক'রে আজ দশেরা উৎসব করছেন, তারই ভেট পাঠিয়েছেন একরাশি গুলাবফুল, একছড়া বহুমূল্য মুক্তোর মালা, আর আমাকে পাঠিয়েছেন মিয়া কুতব খাঁর ঘরে যে এক মহাপুরুষ ফকিরের জপমালা ছিল—সেই জপমালা, তাঁব হাতে লেখা কোরাণশরীফ, একটি উট আর এক খত।

হজরত—বা'জান!

মিল্লাত—খতে লিখেছে, বাদশাহ আজ থেকে উটে চ'ড়ে ইসলামের মহাপুরুষদের দরগায় দরগায় ঘুরে বেড়াবেন। বাদশাহের ঈশ্বরানুরাগ আমাদের সুবিদিত, সুগভীর শ্রদ্ধার হেতু। আমরা আর তাঁকে বিষয়-বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে চাই না।

হজরত—দিল্লী-তখ্‌ত তারা অধিকার করতে চায় ?

মিল্লাত—চায়। তবে আজই নয়। এখন তখ্‌ত শূন্যই থাকবে। আফ-গানের সঙ্গে মীমাংসার পর জয়লাভে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সংবাদে পেয়েছি, কুমার বিশ্বাস রাও বসবেন সিংহাসনে। আমি আজ মুক্ত মা। সেইটেই আনন্দ সংবাদ। খতম আমার বাদশাহী। শুধু একটা কাজ আমার বাকি আছে আমি দুসরা সা-জাঁহা। আমি তৈরী কবর আমার করব—মাটির

কবর—মহি-উলা মিল্লাতের কবর কবর-মহিমহল! হিন্দুরা মহীকে বলে মাটি। হজরত!

হজরত—বা'জান!

মিল্লাত—কই, তোমার বিচিত্র বস্তুটি দেখি।

হজরত—অভিসম্পাত দিতে পারছি না, অথচ বেদনায় ক্ষোভে বুক যেন ফেটে যেতে চাচ্ছে। বা'জান, বাদশাহী বংশ—

মিল্লাত—চুপ কর মা। পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি।

[দুইটি বাঁদী দুইটি পরাত (ট্রে) লইয়া দুয়ারে দাঁড়াইল]

বাঁদী—জাঁহাপনা! শাহজাদী!

মিল্লাত—আ! যা বাঁদী।

[বাঁদীরা আসিয়া পরাত নামাইয়া দিল]

[গোলাপ ফুল, মুক্তার মালা, ফকিরের জপমালা ও কোরানশরীফ রাখিয়া বাঁদীরা চলিয়া গেল]

হজরত—(গোলাপফুল ও মালা একবার নাড়িয়া রাখিয়া দিয়া বলিলেন) বা'জান, এ ভেট আপনি ফেরত পাঠিয়ে দিন।

মিল্লাত—মা!

হজরত—বা'জান, আমি ফকিরিনী, বসরাই গুলাব, পারস্য উপসাগরের মুক্তার মালা—এ আমার জন্য নয়।

মিল্লাত—অন্যায় হবে মা।

হজরত—বা'জান, এই ফকিরের জপের মালাটি আপনার সম্মতি নিয়ে নিচ্ছি। এই আমার কাছে অমূল্য বস্তু।

মিল্লাত—হজরত, আমি জানি মা, তুমি—। তুমি তো আমার কাছে সত্য গোপন কর নি।

[হজরতের দৃষ্টি স্থির হইল]

হজরত—না। করি নি। করব না। পেশবাকুমার বিশ্বাস রাও—আমার আঁখোকি রৌশন, সারা জেহানকি কোহিনুর; বা'জান, আমার নয়নানন্দ সে—সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সে আমার অমূল্য রত্ন। অপরূপ। অপরূপ তার রূপ—আমার সপ্রেম দৃষ্টির আরতিতে অরূপ রতনের মত পবিত্র। আমার শিরার মধ্যে যখন বাদশাহী রক্ত টগবগ ক'রে ফুটে ওঠে, মনে হয়, তাকে আমার দুনিয়ার বিনিময়ে চাই। ইহকাল পরকাল কুল মান সম্পদ—সমস্ত কিছু দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়েও তাকে আমার চাই। কিন্তু—না—তবু সে হয় না, তবু সে হবে না।
(অসহায়ের মত ঘাড় নাড়িলেন)

মিল্লাত—কেন হজরত ?

হজরত—পরক্ষণেই নিজে আমি আমার গলা ঠিপে কণ্ঠরোধ করি—

মিল্লাত—হজরত, বেটী!

হজরত—নিজের কাছেই নিজে আমি হেরে যাই। বা'জান!

মিল্লাত—তুমি জোর কর মা, তুমি জোর কর। আমার ভুল ভেঙেছে। হিন্দু-মুসলমান আমি কিছু নই। আমি মানুষ। বাদশাহী মসনদ, তোমাকে সেলাম, তুমি আমাকে মোহমুক্ত করেছ। এই পাথরের কেল্লা ছেড়ে গাছতলায় গিয়ে মানুষের মধ্যে মিশে যাব। হজরত, ভেঙে ফেল সকল কুণ্ঠার বাধা। জোর কর। আমি জানি, সাগরের মুখে নদীর মত আকুল তোমার কামনা—সামনে খানিকটা মাটির বাধা। মাটির কন্যা দরিয়া, সে মাটি তুমি কেটে ফেল। নইলে তুমি শুকিয়ে যাবে—মাটিই তোমাকে নিঃশেষে শোষণ ক'রে নেবে। মালা গাঁথ হজরত, তুমি বিজয়ী বীরের জন্য মালা গাঁথবে বলেছ—সেই

মালা গাঁথ। ওই মুক্তার মালা তুলে নাও, ওই মালা প'রে তুমি বিজয়ী বীরকে সম্ভাষণ করবে।

[হজরত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

মিল্লাত—হজরত! নাও মুক্তার মালা।

হজরত—না জনাব, সে মালা আমি পেয়েছি। অপূর্ব কণ্ঠহার! দেখবেন। (সে সাপের কঙ্কালটা তুলিয়া ধরিল) এই দেখুন।

মিল্লাত—হজরত!

হজরত—সেই! সেই মৃত্যুপ্রহারী! সেই সাপটার কঙ্কাল! ঠিক তেমনিভাবে দেওয়ালে ঝুলছিল। ফকির বলেছিলেন—সে ম'রে গেছে। মৃত্যু কি মরে জনাব? সে তার জীবন্ত ছদ্মবেশটা ফেলে দিয়েছে। আর দেখবেন?

[ইটখানা দেখাইল। ইটে সাপের ফণাটি ঠিক যেন চিত্র-করা সাপের মাথার মত শুকাইয়া সাঁটিয়া রহিয়াছে]

হজরত—ওর দাঁতের ধার রেখে গেছে আমার চুলের কাঁটায়। (কাঁটা বাহির করিল) আর বিষ আছে ওখানেই। মৃত্যুপ্রহরী আমাকে ত্যাগ করে নি জনাব।

মিল্লাত—না হজরত। ওটা ফেলে দাও। আমি তোমার পিতার তুল্য। আমি বলছি মা, ফেলে দাও ওটাকে।

হজরত—থাক্ জনাব, ও যখন এমন বিচিত্রভাবে আছে, তখন ওকে আমি ফেলব না। জীবনের বাধাকে যদি জয় করতে না পারি, তবে হেরে গিয়ে সমস্ত জীবনটা জ্বলব কেন?

মিল্লাত—না না। নিজেকে তুমি জয় কর, ভেঙে ফেল সব বাধা।

হজরত—আমি ভেঙে ফেলব জনাব, কিন্তু সে?

মিল্লাত—কি বলছ হজরত?

হজরত —আমার সামনে মাটির বাধা, না, সাগর তুলেছে পাহাড়ের আড়াল? আমি বুঝতে পারছি না। সাগর মরে পাহাড়ের কিনারায় মাথা কুটে; নদী শুকিয়ে মাটিতে মিশে যায়। হায় রে হায়! জনাব, এ বুঝি ভাঙে না, ভাঙা যায় না—যায় না ফিরিয়ে দিন, ও ভেট ফিরিয়ে দিন।

মিল্লাত—(চিন্তা করিয়া) তাই হোক হজরত। এ ভেট আমি ফিরিয়েই দেব। এই আমার শেষ বাদশাহী কর্তব্য।

[আশরফের প্রবেশ]

আশরফ—জাঁহাপনা!

মিল্লাত—আশরফ!

আশরফ—শাহ আবদালী দোয়াব থেকে বাঘপথে যমুনা পার হয়েছে—সেনাপথের দিকে এগিয়েছে।

হজরত—আবদালী?

আশরফ—ভয় নেই শাহজাদী, কুঞ্জপুরা থেকে হিন্দোস্তানী ফৌজ নিয়ে কুমার বিশ্বাস রাও, দেওয়ান সদাশিব রাও ভাও উত্তর দিকে গিয়ে তার পাঞ্জাবের পথ আটক করেছেন। পিছন ফিরে দিল্লীর দিকে আসবার তার উপায় নেই; পাঞ্জাবের পথে আফগানিস্তানে ফেরার পথ নেই।

হজরত—খোদা মেহেরবান!

মিল্লাত—(মাথায় হাত রাখিয়া) নাও বেটী, মুক্তার মালা তুলে নাও।

হজরত—না জনাব, না। ও নয়। ও মালা নয়। আপনার ও ফকিরীর মালাও নয়। আমার মালা—আছে।

মিল্লাত—হজরত! (শঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিল)

হজরত—সাপের মণির মালা। আমার মণির কণ্ঠহার।

[দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে সে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল]

চতুর্থ দৃশ্য

পেশবা বালাজী রাওয়ের প্রাসাদ

দৃশ্য-সূচনার অন্ধকারের মধ্যে নরিন্দর গিরি গোস্বামীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—

নেপথ্যে নরন্দির—পেশবা বালাজী বাজীরাও। পণ্ডিত!

[দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল—শূন্য অলিন্দ। মধ্যস্থলে দরজা]

নেপথ্যে নরিন্দর—(পুনরায় ডাকিলেন) পেশবা বালাজী বাজীরাও!

[প্রবেশ করিল একজন প্রহরী। সে মধ্যস্থলের দরজা খুলিল। দেখা গেল ভিতরে বালাজী রাও এবং দুইজন কর্মচারী বসিযা আলোচনামগ্ন]

প্রহরী—(দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল) মহামান্য পেশবা! গোস্বামী মহারাজ নরিন্দর গিরি।

বালাজী—নরিন্দর গিরি মহারাজ? (কর্মচারীর প্রতি) সসম্মানে তাঁকে নিয়ে এস। আগে পাদ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করবে।

[প্রহরী ও একজন কর্মচারী চলিযা গেল। বালাজীরাও ও কর্মচারী বাহির হইয়া আসিলেন। বালাজীরাও শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, মাথার চুল পাকিয়া গিয়াছে, ললাটে রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আভরণহীন কিন্তু দরবারী পোষাকে ভূষিত। মুখে চোখে কঠোর চিন্তার স্পষ্ট ছাপ পড়িযাছে]

বালাজী—পড়, আবার পড় শেষপত্র।

কর্মচারী—"অদূরভবিষ্যতে অতি অল্প কালের মধ্যেই সমগ্র আফগান শক্তিকে গ্রাস করিতে পারিব বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সমস্ত নবাব আমীরেরা প্রতিশ্রুতি দিয়াও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। ধর্মের দোহাই দিয়া বাবরশাহী তখ্‌ত রক্ষার জন্য আফগান শিবিরে সসৈন্যে গিয়া যোগ দিয়াছে। রাজা সুরজমল জাঠ নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করিয়াছে। রাজপুত রাজারাও

তাই। অবিশ্বাসী ও ঈর্ষাকাতর জাঠ কিষাণের দল আদেশ অমান্য করিয়া দলবদ্ধ মর্কটের মত বনে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। শিখ কিষাণেরাও দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। আমাদের বাহিনীতে ষাট হাজার সৈন্য। আবদালীর নিজের চল্লিশ হাজার এবং হিন্দুস্থানের মুসলমান সৈন্য চল্লিশ হাজার, সর্বশুদ্ধ আশি হাজার সৈন্য। তবুও আমি জয়লাভে দৃঢ়বিশ্বাসী। এ পর্যন্ত বারো শো ঘোড়া, চার শো উট এবং চারটি হাতী আমরা কাড়িয়া লইয়াছি। দোয়াবের রসদের পথ বন্ধ হইয়াছে: গোবিন্দ বুন্দেলার পথ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে। আফগান শিবিরে ক্ষুধার তাড়না শুরু হইয়াছে। আমরা স্থির হইয়া বসিয়া আছি।"

বালাজী—হাঁ। (একটু চিন্তা করিয়া) উত্তরে আমার নির্দেশ "কানায় কানায় পরিপূর্ণ জলপাত্র হাতে বিন্দুমাত্র অপচয় না ক'রে পথ চল। স্থির প্রতীক্ষায় লগ্নক্ষণ নির্ণয় কর।"—এই না ?

কর্মচারী—হাঁ, মহামান্য পেশবা।

বালাজী—কবে গিয়েছে সে পত্র ? আজ সাতাশ দিন নয় ?

কর্মচারী—হাঁ, পেশবা।

বালাজী—পত্র হস্তগত হয়েছে এতদিনে। (আবার চিন্তা করিলেন) কৃষ্ণ যোশীর পত্র ? যোশীও এই কথাই সমর্থন করেছে। সে যেন লিখেছে, "মুক্তার মধ্যে সর্বোজ্জ্বল মুক্তার মত বাদশাহের বাদশাহ দুরী দুরানী আহম্মদ শাহের শিবির আজ আট দিন স্তব্ধ।"

কর্মচারী—(পত্র লইয়া খুলিয়া) হাঁ, মহামান্য পেশবা। "আমাদের সৈন্যেরা প্রতিদিন পঞ্চাশ হইতে এক শত জন রোহিলা রসদবাহী সৈন্য ধ্বংস করিতেছে। আফগান শিবিরের বাজারে ছোলার দর টাকায় আড়াই সের, আটা টাকায় তিন সের। দুই টাকা সের মূল্য দিয়াও ঘৃত দুষ্প্রাপ্য। আমাদের শিবিরের বাজারে

আটা ষোল সের, ছোলা বারো সের, ঘৃতের দর টাকায় আড়াই সের।" (থামিল)

বালাজী—(চোখ বুজিয়া বলিয়া গেলেন) তাও জাঠ কিষাণদের অবাধ্যতার জন্যে। "জবাহির সিং তাহাদের নেতা। সে ধুয়া তুলিয়াছে—তোমরা রাজ্য জয় করিয়া রাজা হইবে, আমরা বাঁচিব কি খাইয়া? তাহারা আমাদের অনিষ্ট করে নাই এবং আফগানদের হত্যা করিয়া আমাদের সুবিধা করিতেছে বলিয়া আমরা তাহাকে কিছু বলি নাই।" (চোখ খুলিয়া) উচিত ছিল। উচিত ছিল।

[নরিন্দর গিরি প্রবেশ করিলেন]

নরিন্দর—নমো নারায়ণায়! আনন্দ রহো ভাই! (সবিস্ময়ে) এ কি পণ্ডিত?

বালাজী—নমো নারায়ণায়! নমস্তে গিরি মহারাজ! এ কি গোস্বামীজী, আমিও যে বিস্মিত হচ্ছি আপনাকে দেখে! আপনার চোখ?

নরিন্দর—একটা চোখ দিতে হয়েছে পণ্ডিত। এক পাগল নিয়েছে। একটা বেখেছি কোনমতে। কিন্তু তুমি? পণ্ডিত—

বালাজী—ভিতরে আসুন গোস্বামীজী।

[অগ্রবর্তী হইলেন এবং মধ্যের দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। গিরি অনুসরণ করিলেন]

[দৃশ্যান্তর ঘটিল]

[দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য। শুধু আলো জ্বলিতেছে না। কাল দিনমান]

নরিন্দর—(বালাজীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া) জীবনের জ্যোতিতে ভাস্বর, পণ্ডিত, তোমার এই মূর্তি! দেহ শীর্ণ, মাথার চুল সাদা হয়েছে, মসৃণ ললাটে তোমার ফুটে উঠেছে সারি সারি রেখা। পণ্ডিত!

বালাজী—(হাসিয়া) কালের পথ প্রস্তুতের ভার পড়েছে গিরি

মহারাজা ; বর্তমানকে অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যতের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হতে হয়েছে। বয়স বেড়ে গেছে মহারাজ। এ আমার মহাকালের শুভ্র প্রসাদের চিহ্ন।

নরিন্দর—মানুষ সন্ন্যাসী হয় পণ্ডিত, জীবন হয় না ; মানুষ ইহকাল পরকাল মায়া মমতা সব বর্জন করতে চায় ; জীবন চায় না, সে কেঁদে সারা হয়। আমার চোখে জল আসছে পণ্ডিত। জীবনকে তুমি এ কি পীড়ন করছ ভাই ?

বালাজী—ভবিষ্যতের উদয় হ'লেই আবার আমি নবীনত্ব ফিরে পাব মহারাজ। পানিপথের প্রতীক্ষা করছি আমি। পানিপথেই ভবিষ্যৎ ভূমিষ্ঠ হবে। প্রসন্ন মনে সমস্ত উত্তর-ভারত পরিক্রমা করব, নবকলেবর নিয়ে ফিরব।

নরিন্দর—পানিপথ! পেশবা, পানিপথের কথা নিয়েই আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

বালাজী—নূতন কি সংবাদ আপনি এনেছেন গিরি মহারাজ? (ব্যগ্রভাবে)

নরিন্দর—পণ্ডিত, আমি গভীর বেদনা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

বালাজী—(মুহূর্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন) বুঝেছি গোস্বামীজী, আমি বুঝেছি আপনি যে জন্যে এসেছেন। জবাহির সিং, রঘুনাথ সর্দার—এদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত ছিল মারাঠা সেনাপতির। কর্তব্য কর্মে সে ত্রুটি করেছে।

নরিন্দর—পেশবা! কি বলছ তুমি ?

বালাজী—ঠিক বলছি আমি। আপনি জবাহিরকে মুক্ত ক'রে নিয়েছেন।

নরিন্দর—সে নিষ্ঠুর নির্যাতন তুমি দেখ নি পেশবা, অসুস্থমস্তিষ্ক সরল যুবক—

বালাজী—আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাষ্ট্রনীতি পরিচালক, আমি বিচলিত হতাম না গোস্বামীজী। অসুস্থমস্তিষ্ক বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারীকে আমি শিকলে বেঁধে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিতাম। জবাহির সিং—

নরিন্দর—জবাহির সিংএর কথা থাক্ পেশবা। গোটা হিন্দুস্থানের কিষাণেরা জর্জরিত হয়ে উঠেছে।

বালাজী—রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাই হয় গিরিমহারাজ, তাই হয়।

নরিন্দর—তাই এক রাষ্ট্র-বিপ্লবের পরে আবার রাষ্ট্র-বিপ্লব আসে। পেশবা, তুমি একবার হৃদয় দিয়ে অনুভব কর। দুঃখের তাদের অন্ত নাই, মানুষ ম'রে যাচ্ছে—

বালাজী—গোস্বামীজী, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ। বিরাট যজ্ঞে অনেক বলির প্রয়োজন হয়। মৃত্যু তো পৃথিবীতে অবধারিত, বৃহতের প্রয়োজনে তাকে ত্বরিত ক'রে দেওয়া হয়। শক্তি যেখানে নগ্নিকা, সেখানে তাই তার ধর্ম।

নরিন্দর—(গম্ভীরভাবে) পেশবা, সমস্ত হিন্দুস্থানে আগুন জ্ব'লে উঠবে। উঠবে নয়, বোধ হয় উঠল। বহ্নি আর বায়ু এক হয়ে গেল।

বালাজী—(হাসিয়া উঠিল) বর্ষণে তাকে নিবিয়ে দেব। মেঘ আমার আয়ত্তে গোস্বামীজী। আমরাই মর্ত্যের ইন্দ্র।

নরিন্দর—পণ্ডিত! পণ্ডিত! পাণ্ডিত্যের তীব্রতা তোমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলেছে। তুমি উন্মাদের মত মিথ্যা কল্পনার আকাশপ্রাসাদ রচনা ক'রে তার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ। নিজেকে নিজে প্রতারণা করছ। হয়তো বা—(স্তব্ধ হইলেন)

বালাজী—(হাসিয়া) হয়তো বা নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছি! অভিসম্পাত দিচ্ছেন গোস্বামীজী?

নরিন্দর—না। বেদনায় আমার চোখে জল আসছে। তাই কথাটা

উচ্চারণ করতে পারলাম না। পেশবা, সন্ন্যাসী হয়েও তোমাকে স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি।

বালাজী—গোস্বামীজী, আমার পুত্র পানিপথে, আমার মারাঠা বাহিনী পানিপথে, আত্মীয় বন্ধু সব সেখানে। স্নেহ মমতা—এসবের তৃষ্ণা আমার নাই।

নরিন্দর—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। আত্মপ্রবঞ্চনা করছ তুমি। ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর!

নেপথ্যে প্রহরী—মহামান্ত পেশবা মহারাজ!

বালাজী—মার্জনা করুন গিরি মহারাজ, আগে দেখি কি সংবাদ! (আগাইয়া গেলেন) কি সংবাদ?

নেপথ্যে প্রহরী—পানিপথের পত্রবাহক।

বালাজী—পত্রবাহক! পানিপথের! কই? কোথায়?

[পত্রবাহকের প্রবেশ]

পত্রবাহক—(অভিবাদন ও পত্রদান)

বালাজী—(পত্র পড়িয়া মুঠা করিয়া পেষণ করিতে লাগিলেন পত্র)

নরিন্দর—পেশবা!

বালাজী—(পত্রবাহককে ইঙ্গিত করিলেন) যাও। (সে চলিয়া গেল। স্থির দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া আপন মনে পত্র আবৃত্তি করিয়া গেলেন) "অকস্মাৎ যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হয়েছে। আমিদুল মুল্কের ষড়যন্ত্রে গোবিন্দ বুন্দেলা নিহত হয়েছে। নিষ্ঠুরভাবে তাকে হত্যা করেছে শত্রু। অদৃষ্টের পাকচক্রে, দিল্লী থেকে অর্থবাহক দল রাত্রির অন্ধকারে ভ্রমক্রমে আমাদের শিবিরের পরিবর্তে আফগান শিবিরে ওঠে, তারা ধ্বংস হয়েছে। অর্থ হস্তগত হয়েছে শত্রুর। চন্দ্রগ্রহণের রাত্রে একদল শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'রেও অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। দেওয়ান

বলবন্ত রাও নিহত হয়েছেন। আমাদের শিবিরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হয়েছে। বিনা অর্থে কৃষকেরা শস্য জোগাবে না প্রতিজ্ঞা করেছে।"

নরিন্দর—বালাজী রাও পণ্ডিত, তোমার নীতির তুমি পরিবর্তন কর। আদেশ দাও—মানুষের উপর অত্যাচার না হয়, আদেশ দাও—পানিপথে মারাঠা বাহিনীর পাশে তাদের স্থান দেওয়া হোক। পণ্ডিত—

নেপথ্যে প্রহরী—মহামান্য পেশবা মহারাজ!

বালাজী—(মুহূর্তেই দাঁড়াইয়াছিলেন) কি সংবাদ ?

[প্রবেশ করিল কর্মচারী]

কর্মচারী—আহম্মদ শাহ্ আবদালী এক পত্র পাঠিয়েছেন। এই পত্র।

[বালাজী প্রথম পত্র ফেলিয়া দিলেন। গিরি মহারাজ তুলিয়া লইলেন। বালাজী পত্র লইলেন। পড়িলেন। মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন]

বালাজী—পত্রবাহক অপেক্ষা কংছে ?

কর্মচারী— হাঁ, মহামান্য পেশবা।

বালাজী—উত্তর লেখ, "শক্তিমান আবদালী, আমারও শক্তি আছে, আপনি তা স্বীকার করেছেন; কিন্তু আপনার মত রূঢ় ভাষা আমার নাই। মার্জিত ভাষা যদি মনোমত না হয় মার্জনা করবেন। পাঞ্জাব চেয়েছেন, আর চেয়েছেন হজরত বেগম। পাঞ্জাবে আফগান এসে বাস করছে ব'লে আফগানিস্তানের অংশ ব'লে দাবী জানিয়েছেন। সে দাবী আমি অস্বীকার করি। পাঞ্জাবে আফগানেরা বাস করছে ব'লে পাঞ্জাব আফগানিস্তানের অংশ নয়, আফগানেরা এখানকার রুটি আর মাটির গুণে হিন্দুস্থানবাসীতে পরিণত হয়েছে। আফগান যদি তা স্বীকার না করে, তবে ফিরে যাক তারা আফগানিস্তানে। আমার শিবিরের

অবস্থার কথা লিখেছেন—আমি জানি, আমি জানি—আমাদের বর্তমান অবস্থার কথা—(একটু স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন) না। কোন কথা লিখতে হবে না। শুধু লিখে দাও একটি কথা।—না। আর কিছু না। শুধু—না। যাও।

[পত্রবাহক চলিয়া গেল]

বালাজী—গিরি মহারাজ! (তখন পত্র পড়িতেছিলেন)

নরিন্দর—পণ্ডিত!

বালাজী—আপনাকেও আমার উত্তর—না।

নরিন্দর—বালাজী রাও পেশবা!

বালাজী—আপনাকে আমার বন্দী করা উচিত, কিন্তু—

নরিন্দর—(উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন) কর, কর, বন্দী কর পেশবা। পার তো আমায় হত্যা কর। মহা ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশ করবে, সে দেখার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। হে শঙ্কর! দয়া কর। হে শঙ্কর!

বালাজী—গিরিমহারাজ! (সরোষে)

নরিন্দর—স্নেহ মমতার তৃষ্ণা তোমার নাই পণ্ডিত। কিন্তু তোমার ভয় আছে। ভয়ে তোমার অন্তরাত্মা থরথর ক'রে কাঁপছে। হায় পণ্ডিত! হায় পেশবা! পণ্ডিত, তোমার বুকের ভিতরের কাতর কণ্ঠ বাইরের কোলাহলে তুমি শুনতে পাচ্ছ না। পানি-পথে মারাঠা বিপন্ন, তোমার আত্মীয়স্বজন, তোমার ভাই সদাশিব—

বালাজী—গোস্বামীজী!

নরিন্দর—তোমার পুত্র কার্তিকেয়ের মত কুমার কিশোর বিশ্বাস রাওয়ের সম্মুখে ধ্বংস বিভীষিকা—

বালাজী—গিরিমহারাজ! আঃ! গিরিমহারাজ!

নরিন্দর—বিশ্বগ্রাসী কামনা, আকাশস্পর্শী দম্ভ নিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে মরীচিকা রচনা ক'রে চলেছ তুমি। মাথার উপরে তোমার নেমে আসছে উদ্যত বজ্র—তোমার ভ্রূক্ষেপ নাই। পায়ের তলায় মাটির মানুষে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তোমাকে রক্ষা করতে চাইলে, কাঁদলে, তুমি শুনলে না। অথচ তুমি শঙ্কায়, উদ্বেগে বিক্ষিপ্তচিত্ত অধীর; থরথর ক'রে কাঁপছ তুমি। পত্রখানির শেষ পর্যন্ত তোমার পড়বার ধৈর্য হ'ল না পেশবা। পড়—পড় পেশবা, পত্রের শেষ কয় ছত্র পড়। আমি চললাম। সাত সপ্তাহ। চার সপ্তাহে এসেছে, আর তিন সপ্তাহ। আমি চললাম পণ্ডিত।

বালাজী—মহারাজ!

নরিন্দর—অবসর নাই। পত্র প'ড়ে দেখ। (পত্র ফেলিয়া দিয়া) পানিপথ! পানিপথ! শঙ্কর! শঙ্কর!

[দ্রুত প্রস্থান করিলেন]

বালাজী—(পত্র কুড়াইয়া লইয়া পড়িলেন) আ! মাত্র সাত সপ্তাহের রসদ আমাদের বর্তমান! তাও এক বেলার হিসাবে। অর্থভাণ্ডার শূন্য। তারপর জানি না। (আপন মনে বলিতে লাগিলেন) তারপর জানি না। তারপর জানি না। হিসাব? হিসাব জানি না। হিসাব!

[মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। স্থির দৃষ্টিতে ভাবিতে লাগিলেন—যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত]

বালাজী—আবদালীর রসদের পথ মুক্ত। অর্থভাণ্ডার শূন্য। পথে মারা পড়েছে। সাত সপ্তাহের রসদ বর্তমান! তারপর জানি না।

গোবিন্দ বুর্দেনা নাই। সাত সপ্তাহ! সাত সপ্তাহের পরে? তার পরে?—খাদ্যাভাবে শীর্ণ মারাঠা! হিন্দুস্থানে মানুষ মারাঠার বিরোধী! হিন্দুস্থানে আগুন জ্ব'লে উঠেছে? বহ্নি এবং বায়ু মিলিত হয়েছে! তারই মধ্যে মারাঠা! সামনে—আশি হাজার পাঠান সৈন্য। আবদালী আহমদ শাহ! পরাজয় তার ভাগ্যে নাই! সাত সপ্তাহ! চার সপ্তাহ চ'লে গেছে। এক, দুই, তিন, তারপর? নিরুপায় মারাঠা-বাহিনী মৃত্যুমুখে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে চলল!

[থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, যেন চোখে দেখিতেছেন]

বালাজী—ধূলো উড়ল; কেঁপে উঠল আকাশ,—এগিয়ে এল পাঠান—! প্রচণ্ড সংঘাত! (চীৎকার করিয়া উঠিলেন)—বিশ্বাস রাও! সদাশিব! মারাঠা! মারাঠা! (অপেক্ষাকৃত সহজ স্বরে) পানিপথ—পানিপথ! আমি যাব। আমি যাব। পানিপথ!

[প্রচণ্ড সংঘাতদ্যোতক শব্দ বালাজী রাও শুনিতে পাইলেন। শব্দ উঠিল। সব অন্ধকার হইয়া গেল]

পঞ্চম দৃশ্য

পানিপথ-সন্নিহিত গ্রাম্য প্রান্তরের জঙ্গল

[দৃশ্য সূচনায় অন্ধকারে সংঘাতদ্যোতক শব্দ এবং তোপধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার রেশ মিলাইয়া যাইতে যাইতে ধীরে ধীরে লাল আলো ফুটিয়া উঠিল। সন্ধ্যার আভাস জাগিয়া উঠিল। পানিপথের শেষ তোপধ্বনি ধ্বনিত হইবা ধীরে ধীরে সব স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকাল, দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। আকাশে রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। জনহীন জঙ্গলের মধ্যে জবাহির সিংহের দল লুকাইয়া আছে। জবাহির ধীরে ধীরে একটি গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল। স্থিরদৃষ্টিতে পানিপথ-প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিছন হইতে প্রবেশ করিল গন্না বেগম। তাহার অঙ্গে যোদ্ধার পরিচ্ছদ—কাঁধে বন্দুক, কোমরে তলোয়ার। সে পিছন হইতে আসিযা জবাহিরের কাঁধে হাত রাখিল। জবাহির মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আবার পানিপথের দিকে চাহিয়া বলিল]

জবাহির—মাট্টি লাল হয়ে গেল। রক্তে ভেসে গেল পানিপথ। আসমানে তার ছটা বাজল; সারা আসমানটা লাল! ও এখনও কি ধূলো উড়ছে দেখ! ধূলো পর্যন্ত রক্তের মত রাঙা! লাল! পানিপথের লড়াই শেষ! মরা মানুষে পাহাড় হয়ে গিয়েছে। হে ভগবান!

গন্না—ভগবান! ভগবান কি করবে সর্দার? মানুষের করমফল; মানুষের করম বাধিয়ে তোলে যুদ্ধ, যুদ্ধ নিয়ে আসে ধ্বংস। লোভে-হিংসায় মানুষ অন্ধা হয়ে যায় জবাহিরজী—ব'নে যায় জানোয়ার; জানোয়ারের মতই ডাক ছেড়ে এ ওর ঘাড়ে পড়ে ঝাঁপ দিয়ে, টুঁটি কামড়ে ধরে, নিজেদের রক্তে আসমান মাটি লাল ক'রে দেয়।

জবাহির—তাই বটে রন্না, তাই বটে। এত বড় ধরতি, এত এলাকা, এত ক্ষেতি, এত ফসল, এত পানি, তবু মানুষ খুশি হয় না। এক-

একজন মালিক সেজে মানুষকে ভুলিয়ে দল বেঁধে বলে—সব আমার। ওদিক থেকে আর একজন ব'লে ওঠে—না, সব আমার। বাস্। পানিপথ!

গন্না—তুমি যেন রাজা হয়ে ব'সো না মেরি সর্দার! তুমি যেন কিষাণ জাঠদের মালিক সেজে ব'লো না—সব আমার।

জবাহির—না রট্টা, না।

গন্না—সর্দার, দেখছ? ওই—! আ-হা-হা! হাতীর উপরে—মুখে লাল ছটা বেজেছে সন্ধ্যার আলোয়! জবাহিরজী! ও কি ঘুমিয়েছে? না—আঃ—মুখে যে সে কথা বলতে পারছি না সর্দার। তিন দিন আগে যে মরেছে তার এত রূপ?

জবাহির—ওই—ওই কুমার বিশ্বাস রাও! আ-হা-হা! একেবারে ভবানীমায়ের কুমার কার্তিক! ম'রে গিয়েছে। আফ্‌গানেরা নিয়ে যাচ্ছে দেহটা। দেখাচ্ছে সকলকে—মারাঠা-প্রধানকে তারা খতম করেছে। খত গেল পেশবার কাছে—দুটি মুক্তা, সাতাইশ মোহর, চাঁদির টাকা, তামার দামড়ির হিসাব নাই, পানিপথের ধূলোয় মিশে গেল। দুটি মুক্তা—একটি কুমার বিশ্বাস রাও, একটি মারাঠা প্রধান সদাশিব রাও ভাও! পানিপথ, হা রে পানিপথ! মারাঠা খতম হয়ে গেল পানিপথে!

গন্না—আফগানও গিয়েছে। সেও খতম হবে। দুটো শেরে লড়াই হ'লে সর্দার, একটা হয়তো তখুনি মরে, কিন্তু যেটা জিতেছে মনে ক'রে বন কাঁপিয়ে চেঁচায়—সেটা মরে দশ দিন পরে। ভাঙা পাঁজরা ভোঁতা থাবা নিয়ে কাঁন্দরার মধ্যে গোঙায়, ধুঁকে ধুঁকে মরে। আফগান মরবে।

জবাহির—আফশোষ, আফশোষ রট্টা—হিন্দুস্থানের বুক কবরস্থান ক'রে দিয়ে গেল লুঠেরা—তার কবর আমরা খুঁড়তে পারলাম না।

মারাঠা আমাদের উপর কম জুলুমবাজী করে নি, কম ঘেন্না করে নি, বলত—বান্দর; কিন্তু তবু তারা হিন্দুস্থানের শের, তাই বহুৎ দুখ—বহুৎ দুখ আমার মনে। আফগান লুঠেরা—ওঃ— আবদালীকে দেখলে শরীর শিউরে ওঠে; পেশবা বালাজী রাও— ব্রাহ্মণ, আ—কি ঝকমক আলো তার মুখে তার কথায়! তাই দুখ মারাঠার জন্যে। আফগান আমাদের বলে—নেকড়া। আমরা নেকড়া, আমরা তাকে ছিঁড়তে পারতাম রট্টা।

গন্না—ওঠ সর্দার, আগুন জ্বালো। (জবাহিরের হাত চাপিয়া ধরিল সর্দার! জখমী শেরটা কান্দাহারে তার কন্দরে ফিরবে! চল সর্দার, নেকড়ার মত আমরা পাশে পাশে ছুটি। সুযোগ পেলেই কামড়াই।

জবাহির—হাঁ রট্টা, হাঁ। চল। তাই যাব। যা নিয়ে যাচ্ছে মুখে ক'রে, তা যতটা পারি ছিনিয়ে নিয়ে আসব। রট্টা, যে মারাঠী বহুজীকে কাল আমরা বাঁচিয়েছি, তার কান্না আমার বুকে এখনও বাজছে। কত বহু, কত বেটী এখনও আছে। ছিনিয়ে নোব তাদের। হিন্দু এখনও আছে। ছিনিয়ে নোব তাদের। হিন্দুস্থানের দৌলত যতটা পারি ছিনিয়ে নোব। চ'লে যাব। হো—জাঠ-ভাইয়ো। হো—

[নরিন্দর গিরির দ্রুত প্রবেশ]

নরিন্দর—কে? জবাহির?

জবাহির—কে? গুরু মহারাজ? প্রণাম—বাবা গুরু।

[নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া আর উঠিল না, বসিল]

নরিন্দর—জবাহির! পানিপথ শেষ?

গন্না—শেষ গুরু মহারাজ।

নরিন্দর—মারাঠা শেষ?

গন্না—কিন্তু আমরা আছি মহারাজ।

নরিন্দর—তোমরা আছ, যারা বেঁচেছে তাদের বাঁচাতে পেরেছ ?

জবাহির—যারা আমাদের এলাকায় এসেছে তাদের বাঁচিয়েছি। আমাদের রুটির ভাগ দিয়েছি, জল দিয়েছি। কিন্তু এখনও—এখনও অনেক।

নরিন্দর—কুমার বিশ্বাস রাও নাই ?

গন্না—নাই মহারাজ, নাই। হাতীর উপর তার শবদেহ দেখেছি মহারাজ। ভাও মহারাজ হাতীর উপর কুমার সাহেবের দেহ চাপিয়ে তাকে দু চোখ ভ'রে দেখালে। কুমারের সে দেহ দেখে আফগানেরা 'হায়—হায়' ক'রে উঠল। ও! মহারাজ! কুমার যেন নিদ গেল।

জবাহির—তারপর গিরি মহারাজ, ভাও সাহেব তার খোরাসানী ঘোড়ায় চ'ড়ে হরহরধ্বনি দিয়ে ছুটল। সঙ্গে ছুটল—বড় বড় মনসবদার দশ বিশ জন, আর শ দুয়েক সওয়ার। আফগানের হাজার দু হাজার জম্বুরাক কামান গর্জে উঠল। চার পাঁচ হাজার সওয়ার ছুটে এল ;—ধূলো উড়ল ; বাস্, মরণ—সমুন্দরের লোনা জলে নুনের পুতলীর মত তারা গ'লে গেল।

নরিন্দর—শঙ্কর—শঙ্কর ! তারপর ?

জবাহির—তবু ভাওজী বীর মরে নি। মরণ হয় নি। তিন তিন ঘোড়া মরল। শেষ পায়ে গুলি বিঁধে পড়ল ভাও সাহেব। আবার উঠল। ভাঙা বর্শা—তারই পর ভর দিয়ে এগোলো আফগানদের দিকে। চোখে ভাসছিল মরণের স্বপন। আফগান এগিয়ে এল। তাদের চোখ—ভাও সাহেবের কানের মুক্তার দিকে, গলার মালার দিকে। পাঁচ আফগান ঘিরলে, বললে—কাফির, ফেল্ তলোয়ার। তিনজনকে করলে জখম। নিজে পড়ল।

আফগান তার মাথাটা কেটে নিয়ে গেল। খতম হ'ল পানিপথ। কি করব গুরু মহারাজ ? আমাদের নিলে না লড়তে। আমাদের পেলে কয়েদ করতে, চাবুক মারতে হুকুম ছিল। নইলে আমরাও মারতাম। আফশোষ থাকত না।

গন্না—আফশোষ রাখব না। থাকবে না আফশোষ। চল, আমরা যাব।

জবাহির—চরণ দাও গুরু মহারাজ। আমরা যাব।

গন্না—আবদালী ফিরবে দিল্লী হয়ে আফগানিস্তান। জিতেছে সে, কিন্তু পাঁজরা তার ভেঙেছে। ওই ঘা তার শুকোতে দেব না। জঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে আমরা পাশে পাশে ছুটব।

জবাহির—জখমী শেরের পাশে নেকড়ার মত। আবদালী আমাদের বলে—নেকড়া। হাঁ। গুরু মহারাজ! কত বহু, কত বেটী, কত বাল-বাচ্চা তারা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—তা তুমি জান না। হিন্দু বাছে নি, মুসলমান বাছে নি। লুঠেছে। নিজেরা বাজার বসিয়ে দামড়ি দাম নিয়ে মানুষ বেচেছে। হিন্দুস্থানের দৌলত বুঝি আর রাখে নি। এত সোনা রূপা জহরত মহারাজ যে—তামা পিতল কাঁসার জিনিস তারা ভেঙে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। আমরা যত পারি ছিনিয়ে নেব।

নরিন্দর—"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী !"

জবাহির—গুরু মহারাজ, কি বলছ তুমি ?

নরিন্দর—বলছি, যাবে বইকি। নিশ্চয় যাবে যাত্রী।

জবাহির—আ! গুরু মহারাজের হুকুম মিলেছে, আশিস্ মিলেছে—আর কি ? (হাত তুলিয়া ডাকিতে গিয়া হাত তুলিয়াই থমকিয়া বলিল) ও কি ?

নেপথ্যে বালাজীর কণ্ঠস্বর—বিশ্বাস রাও! সদাশিব রাও ভাও! মারাঠা!

[তিনি তাঁহাদের খুঁজিতেছিলেন। মস্তিষ্ক অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। মারাঠারা যেন দূরে বা কাছে কোথাও রহিয়াছে। তিনি তাহাদের ডাকিতেছেন]

নরিন্দর—(ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন) পণ্ডিত! পেশবা বালাজী বাজী রাও!

গন্না—দুর্ভাগা পেশবা!

জবাহির—পেশবা মহারাজ বালাজী বাজীরাও!—আ! (মৃদু স্বরে সবিস্ময়ে সসম্ভ্রমে)

নরিন্দর—তোমরা যাও জবাহির। চ'লে যাও নিজের পথে। পেশবা পণ্ডিত বালাজী রাও—সে খুঁজছে তার মারাঠাকে, তার সন্তানকে, তার আত্মীয়কে, সে তোমরা দেখো না। চ'লে যাও। দেখেছ? আলো জ্বালিয়ে মিছিল ক'রে একটা তাঞ্জাম চলল, দেখেছ?

নেপথ্যে বালাজী—বিশ্বাস রাও! কুমার বিশ্বাস রাও! মারাঠা—!

জবাহির—হাঁ। রট্টা! হে জাঠ ভেঁইয়ো—হে!

[চাপা গলায় হাঁকিতে হাঁকিতে বাহির হইয়া গেল। নরিন্দর গিরি দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্ধকার হইল মঞ্চ]

ষষ্ঠ দৃশ্য

আহমদশা আবদালীর-শিবির

[অন্ধকারের মধ্যে শব্দ হইল—ধীরসে—তল্লাস, ধীরসে। আলোর মধ্যে দেখা গেল শিবিরের মধ্যে তাঞ্জাম নামানো। বাহির হইতে প্রবেশ করিল আবদালী—ক্রুদ্ধ উল্লাসে উল্লসিত। 'আ' শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল]

আবদালী—আ! ফকিরিনী বেগম! ফকিরিনী বেগম! আসতে হয়েছে? এইবার? এইবার ফকিরিনী? কি করবি?

হজরত—কি করব ? শাহানশাহ্‌কে মালা দেব।

[বাহির হইলেন তাঞ্জাম হইতে]

[আবদালী হাসিয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলেন]

হজরত—(সাপের কঙ্কাল-গাঁথা মালা বাহির করিয়া ধরিল) নাও মালা, শাহানশা। মালা নাও।

আবদালী—(পিছাইয়া গেল) আ!

হজরত—ভয় পেলে শাহ্ আবদালী ? সাপের মণির মালা। পরো। পরবে না ? তবে আমি পরি।

আবদালী—(ছোরা বাহির করিল) শয়তানী !

হজরত—শাহানশা! মরণকে আমি ভয় করি না। সাপের বিষ-মাখানো কাঁটা আমার সঙ্গে। মরতেই আমি এসেছি। আমাকে তুমি মারবে, আমি কোন রকমে তোমার হাতে কাঁটাটা বিঁধিয়ে দেব। তুমি মনে করেছ, পানিপথে জিতেছ ব'লে সারা হিন্দুস্থানকে জিতে নিয়েছ ? না না, তুমি জেতো নি। সেই কথা বলতেই আমি এসেছি। নইলে ঘরেই মরতাম।

আবদালী—তোর এত বড় সাহস পচা বাদশাহের ঘরের বেটী ? আমি জিতি নি ?

হজরত—তোমার চোখে-মুখে হারের ছাপ পড়েছে শাহনশাহ। কথাটা বলতেও তুমি জোর পেলে না। জিতেছ তুমি ? জিতেছ ? তোমার অর্ধেক ফৌজ খতম।

আবদালী—এও ! (চীৎকার করিয়া উঠিল)

হজরত—তোমাকে আমি ভয় করি না শাহানশাহ। তোমাকে ভয় আমি জয় করেছি। হাতে আমার এই কাঁটা হাতিয়ার। জিন্দিগীর কোন দাম আমার নাই, মৃত্যুকামনা আমার বর্ম।

কেন ভয় করব তোমাকে? তুমি যখন নাদের শাহের নোকরি করতে, তখন তো ভয় করতাম না। আজ কেন করব? তুমি জেতো নি শাহানশাহ। ইসলামের জিগীর তুলে মারাঠাকে খতম করেছ। কিন্তু হিন্দুস্থানের মুসলমান আর তোমাকে চাইবে না। বেশিদিন থাকলে তারাই তোমাকে খতম করবে। পালাও তুমি শাহানশাহ, তুমি পালাও। হিন্দু চাষীর সঙ্গে মুসলমান চাষীও ক্ষেপবে। আর তারা মানবে না। পেটের জ্বালা—বুকের জ্বালা—জ্বলবে এবার। ইসলামের ধ্বজা তুলে তুমি বাঁচবে না।

আবদালী—অধর্মী তুই। তাই তোর এমন মতি।

হজরত—হাঁ! তুমি খাঁটি মুসলমান! জেনানী হ'ল জননী, তার ইজ্জত তুমি পায়ের তলায় দ'লে দাও। তুমি মুসলমান! মানুষ খোদাতয়লার সৃষ্টি, তার গলা কেটে তুমি নাচ। তুমি মুসলমান! তুমি ঘর জ্বালাও, তুমি লুঠ কর। তুমি মুসলমান! ধার্মিক! আমি অধর্মী?

আবদালী—(চীৎকার করিয়া) আরে, তুই কাফিরের মহব্বতিতে দেওয়ানা।

হজরত—ঝুট। ঝুট। ঝুট।

আবদালী—পেশবার বেটা বিশ্বাস রাওয়ের সুরত দেখে তুই ভুলিস নি?

হজরত—ভুলেছি। সুরত দেখে কে না ভোলে? আবদালী, তার সুরত দেখে তোমার আফগান রিসালারা 'হায় হায়' করেছে। মাথা কেটে বর্শায় গাঁথা তোমাদের উল্লাস-বিলাস! তার সুরত দেখে তোমরা তার মাথা কাট নি! তেমনি ভুলেছি আমি। মহব্বতি নয়।

আবদালী—জরুর মহব্বতি। তোর মহব্বতির কিচ্ছা আফগানিস্তানে ব'সে আমি শুনেছি। শাহফানা আমাকে বলছে।

হজরত—মানুষের মনে একটা মক্ষি—মাছি আছে শাহ আবদালী। তারা মধুর উপর ব'সে তাতে বিষ মাখিয়ে দেয়।

আবদালী—ওরে লৌণ্ডি—

হজরত—খবরদার আবদালী! আমি শাহজাদী।

আবদালী—শাহজাদী! (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

হজরত—শাহজাদী বলতে যদি ঘেন্না হয়, তবে ফকিরিনী বল। আমি ফকিরিনী।

আবদালী—আ! ফকিরিনী! আবে ফকিরিনী, তোর কথা যে সত্যি তার সাবুদ কি?

হজরত—সাবুদ দেব খোদাতায়লার কাছে। তোমার কাছে কি দেব? আমি ব'লে যাই, বিশ্বাস করতে হয় কর—নয় ক'রো না। পেশবার বেটার সুরত দেখে ভাল আমার লেগেছিল—চোখে নেশার সুরমা পরিয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ওকে না পেলে দু'নিয়ার কোন দাম নেই, জিগিন্দির কোন দাম নেই। হয়তো তারও লেগেছিল ভাল। কিন্তু আমি মুসলমানের বেটী, আমি ধরম ছেড়ে কেন তার জন্য দেওয়ানা হব? সেও হয় নি। সে যদি তার ধরম ছেড়ে বলত—আমি শুধু মানুষ। তবে আমি বলতাম—আমিও মানুষ। সেও তা করে নি, আমিও করি নি। আমি খোদার নাম জপ ক'রে নিজেকে জয় করেছি। শাহ আবদালী, এই কথা বলতে—চেঁচিয়ে বলতে শুধু তোমার এখানে এসেছি। নইলে এ কাঁটা আমার বিছানায় থাকে।

আবদালী—ফেলে দে ও কাঁটা। ফেলে দে ও মালা।

হজরত—ডর লাগছে ? (হাসিয়া উঠিল)

আবদালী—সয়তানী, ডাইনী, তোকে সায়েস্তা করব আমি। বহুৎ আওরৎ আমি দেখলাম।

হজরত—হাঁ, তা দেখেছ। দেখেছ তুমি, যে আওরৎ প্রাণ ফাটিয়ে কেঁদেছে, সে আওরৎ তোমার ছুরির ভয়ে চুপ হয়ে গেছে। তুমি দেখেছ, কতজন তোমার মুখ দেখে ভয়ে নিষ্প্রাণের মত আত্মসমর্পণ করেছে। তুমি দেখেছ দিল্লীর বাদশাহের বেটী নাদের-শাহের বেটার বহু আয়ফতকে, সে সভয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। তুমি দেখেছ বেগমকে, সে অঝোর ঝরে কেঁদে বিষ খাব ব'লেও খেতে পারে নি। তুমি দেখেছ হয়তো হাজারো এমনি অওরৎ। তা থেকেই তুমি তৈরী করেছ আওরৎদের স্বভাবের ইতিহাস! হাঁ, সে ইতিহাসের বিচারে তুমি নির্ভুল করেছ বটে। অসহায় আওরৎ—শেষমুহূর্তে জীবনের মায়ায় হার স্বীকার ক'রে আত্ম-সমর্পণ করে, তারপর স'য়ে যায়, আবার হাসে আবার গান গায়। কিন্তু মাথা তুলে দাঁড়ায়, প্রাণটা হেলায় দেয়—এমনও তো না-দেখা নও। কেন মনে থাকে না ? তাই—তাই তোমাকে আমি ভয় করি না। দেখবে? তুমি দেখবে? দেখবে?

[কাঁটাটি নিজের গলায় বসাইয়া দিল]

আবদালী—হাকিম! হাকিম!

হজরত—হাকিমের সাধ্য নাই শাহ্ আবদালী। বৃদ্ধ গোখুরার বিষ। ফাঁপা কাঁটার ভিতরটা পূর্ণ হয়ে আছে। (শুইয়া পড়িল একটি আসনে)

আবদালী—(ছুঁইতে গিয়া ছুঁইতে পারিল না।)

হজরত—ছুঁয়ো না আমাকে, ছুঁয়ো না। শুধু ঢেকে দাও, কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও। চিৎকার করব না। নিঃশব্দে মরব আমি।

[আবদালী ঢাকিয়া দিল]

আবদালী—(কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া) আরে লৌণ্ডি ! আরে লৌণ্ডি !

[তরুণীর প্রবেশ]

তরুণী—জাহাপনা !

আবদালী—(ছোরা বাহির করিয়া) তোকে খুন করব আমি। তোর কলিজা চিরে বের ক'রে কুত্তাকে খাওয়াব আমি।

তরুণী—জাহাপনা !

আবদালী—না। না। তুই না। জেহান খাঁ !

[জেহান খাঁর প্রবেশ]

জেহান—জাঁহাপনা !

আবদালী—শাহফানা ! শাহফানা ! তাকে—তার চোখ দুটো তুলে দাও। যে চোখে সে নসীব গুনেছে, সেই চোখ দুটো। আমাকে—

[জেহান প্রস্থান করিল]

[আবদালী ধীরে ধীরে গিয়া হজরতের মুখের কাপড় তুলিল]

আবদালী—আ ! নীল হয়ে গেল !

[কাপড় ঢাকিয়া দিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, তরুণীটি দাঁড়াইয়া আছে]

আবদালী—লৌণ্ডি !

তরুণী—জাঁহাপনা !

আবদালী—আমি হেরে গেলাম। এত বড় ফৌজ আমার অর্ধেক শেষ হয়ে গেল। হিন্দোস্থানের নবাব আমীররা ভিতরে ভিতরে শল্লা জুড়েছে। এখানে থাকলে খতম ক'রে দেবে আমাকে। এতটা পথ কান্দাহার আমি ফিরব কি ক'রে? পেলাম কি? কি নিয়ে ফিরব? আ! আমি হেরে গেলাম।

[নাজিব খাঁর প্রবেশ]

নাজিব—শাহানশাহ ! পেশবা ফৌজ নিয়ে রওনা হয়েছে শুনে খবর

নিতে পাঠিয়েছিলাম! পেশবা আসছিল। কিন্তু পথে—পানি-
পথের খবর শুনে পাগল হয়ে গেছে।

আবদালী—পাগল হয়ে গেছে? আঃ! খোদা!

[নেপথ্যে বালাজীর কণ্ঠস্বর যেন তাহার কানে ভাসিয়া আসিল—বিশ্বাস রাও! সদাশিব রাও ভাও! মারাঠা!]

আবদালী—ওঃ! শাহ নাদের পাগল হয়েছিল।

নাজিব—তবে পাঞ্জাবের খবর সত্যি। শিখেরা বহুৎ সোর তুলেছে।

আবদালী—আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল নাজিব খাঁ।

নাজিব—কেন জাঁহাপনা?

আবদালী—পানিপথের পর আমার তাগদ যেন নষ্ট হয়ে গেছে।
যেটুকু ছিল, তাও আজ গেল।

নাজিব—কি হয়েছে শাহনশাহ?

আবদালী—তা বলতে পারব না। কেউ জানবে না তা দুনিয়ায়, দেব
না জানতে। শুধু এইটুকু বলছি—পানিপথের জয়। নাজিব
খাঁ—! আমি যদি পাগল হয়ে যাই নাজিব খাঁ?

[নেপথ্যে পর পর কয়েকটি গুলির আওয়াজ হইল]

[তাঁবুর দরজা হইতে একটা সিপাহী আসিয়া লুটাইয়া পড়িল]

আবদালী—এ কি? গুলি?

[নেপথ্যে হইতে ভাসিয়া আসিল—হো-হো-হা! হো-হো-হো! হো-হো-হো! হো-হো-হা!]

আবদালী। আ! নেকড়া! নেকড়া!

[আবার বন্দুকের শব্দ হইল]

[আবদালী নিজে ফুঁ দিয়া বাতি নিবাইয়া দিল]

[রঙ্গমঞ্চে রাত্রি ফুটিয়া উঠিল]

নেপথ্যে—বাত্তি নিভাও—বাত্তি নিভাও। নেকড়া!

আবদালী—নাজিব! জলদি, জলদি ছাউনি তোল। জলদি! কবরস্তান পানিপথ! কবরস্তান!

[নাজিব ছুটিয়া চলিয়া গেল]

নেপথ্যে বালাজী—মারাঠা! মারাঠা! মারাঠা!

অন্য দিকে নেপথ্যে—হো-হো-হো! হো-হো-হো! হো-হো-হো!

[আবদালী তাঁবুর পর্দা খুলিলেন, দূরে পাহাড়ের আড়ালে নীলাভ অন্ধকারে দেখা যাইতেছে—গঙ্গা, মধ্যস্থলে নরিন্দর]

নরিন্দর—পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা—যুগ-যুগ ধাবিত যাত্রী, হে চির সারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি!

[আবদালী ফেলিয়া দিলেন পর্দা]

[এই সঙ্গীতের সঙ্গে মিলাইয়া—হো-হো-হো! হো-হো-হো]

দারুণ বিপ্লব মাঝে
তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট-দুঃখ-ত্রাতা
হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা!

[যবনিকা পড়িল]

২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কাত্যায়নী বুক ষ্টল হইতে শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র সোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ৬৭ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্রীকালী প্রেস হইতে শ্রীপরমানন্দ সিংহরায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।